হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যদি আমি এক সা' খাদ্যের জন্যে মুসলমান ভাইদেরকে একত্রিত করি, তবে তা আমার কাছে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার চেয়েও উত্তম। হযরত ইবনে ওমর বলতেন ঃ সফরে উৎকৃষ্ট পাথেয় থাকা এবং বন্ধুদের জন্যে ব্যয় করা মানুষের অন্যতম বদান্যতা। সাহাবায়ে কেরাম বলতেন ঃ খাওয়ার জন্যে একত্রিত হওয়া উত্তম চরিত্র। তাঁরা কোরআন তেলাওয়াতের জন্যে সমবেত হতেন এবং বিদায় হওয়ার সময় কিছু খেয়েই বিদায় হতেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে– আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতের দিন বান্দাকে বলবেন ঃ হে ইবনে আদম, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম। তুমি আমাকে অন্ন দাওনি। বান্দা বলবে ঃ ইলাহী, আপনি তো বিশ্বের পালনকর্তা, আমি আপনাকে অন্ন দেব কিরূপে? আল্লাহ বলবেন ঃ তোমার মুসলমান ভাই ভুখা ছিল। তুমি তাকে খেতে দাওনি। যদি তাকে খেতে দিতে তবে তা আমাকেই দেয়া হত। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ কেউ তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে তার তাযীম কর। তিনি আরও বলেন ঃ জান্নাতে এমন বাতায়ন রয়েছে, যার ভেতর থেকে বাইরে এবং বাইরে থেকে ভেতরের সব কিছু পরিদৃষ্ট হয়। এ বাতায়ন তাদের জন্যে, যারা নরম কথাবার্তা বলে এবং নিরন্নকে অন্ন দেয়। রাতে মানুষ যখন নিদ্রিত থাকে, তখন তারা নামায পড়ে। তিনি আরও বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে অপরকে খাওয়ায়। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, যেব্যক্তি তার ভাইকে পেট ভরে খাওয়ায় এবং পিপাসা নিবৃত্ত করে পানি পান করায়, আল্লাহ তাআলা তাকে দোযখ থেকে সাত খন্দক দূরে রাখবেন। প্রত্যেক দু'খন্দকের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে পাঁচ'শ বছরের পথ।

মেহমান আসার ব্যাপারেও কিছু আদব রয়েছে। কারও কাছে গেলে যাওয়ার সময় আন্দাজ করে যাওয়া এবং যখন সে খেতে থাকে, তখন উপস্থিত হওয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ ـ

অর্থাৎ, তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাদ্য প্রস্তুতির

অপেক্ষা না করে আহারের জন্যে নবী গৃহে প্রবেশ করো না।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি এমন খাদ্যের দিকে যায়, যার জন্যে তাকে ডাকা হয়নি, সে যাওয়ার সময় ফাসেক হবে এবং হারাম খাবে, কিন্তু কেউ যদি ঘটনাক্রমে খাওয়ার সময়ে পৌঁছে যায় তবে তার জন্যে গৃহকর্তা অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত না খাওয়া সমীচীন । যদি মনে হয় গৃহকর্তা অন্তর দিয়েই সঙ্গে খাওয়াতে চায়, তবে তার সাথে শরীক হয়ে যাবে। আর শরমে পড়ে খাওয়াতে চায় বলে মনে হলে খাওয়া উচিত নয়। যদি কেউ ক্ষুধার্ত হয় এবং খাওয়ার উদ্দেশেই কোন ভাইয়ের কাছে যায়, তবে এতে কোন দোষ নেই। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) এক সময় ক্ষুধার্ত ছিলেন। অতঃপর উভয়ে মিলে আবুল হায়সাম ইবনে কায়হান ও আবু আইয়ুব আনসারীর গৃহে চলে গেলেন কিছু খাওয়ার উদ্দেশে। এটাই ছিল পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের অভ্যাস। আওন ইবনে আবদুল্লাহ্ মসউদীর তিনশ' ষাট জন বন্ধু ছিল। তিনি সারা বছর প্রত্যেকের বাড়ীতে একদিন করে থাকতেন। অন্য এক বুযুর্গের ত্রিশ জন বন্ধু ছিল। তিনি এক এক মাসে প্রত্যেকের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসতেন। অন্য এক বুযুর্গের সাত জন বন্ধু ছিল। তিনি সপ্তাহের সাত দিন সাত জনের বাড়ীতে বেড়াতেন। তাবাররুকের নিয়তে এই বুযুর্গগণের খেদমত এবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং কেউ যদি বন্ধুর গৃহে এসে তাকে না পায় এবং ভরসা রাখে, তার এখানে কিছু খেলে সে খুশী হবে, তবে সে বন্ধুর অনুমতি ছাড়াই সেখানে খেতে পারে। কেননা, অনুমতি সন্তুষ্টি বুঝার উদ্দেশেই দরকার হয়, বিশেষতঃ খাদ্যবস্তুর ক্ষেত্রে। কেউ কেউ মুখে পরিষ্কার অনুমতি দেয়, কিন্তু মনে সন্তুষ্ট থাকে না। এরূপ লোকের খাদ্য খাওয়া অনুমতি সত্ত্বেও মাকরূহ। বন্ধুদের গৃহে খাওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা اَوْصَدِيْقِكُمْ বলেছেন। অর্থাৎ, বন্ধুদের কাছে খেলেও কোন গোনাহ নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার হযরত বরীরার বাড়ীতে তশরীফ নিয়ে যান। বরীরা তখন বাড়ী ছিলেন না। সেখানে খয়রাতের খাদ্য বিদ্যমান ছিল। তিনি খেয়ে নিলেন এবং বললেন, সদকা তার ঠিকানায়

পৌঁছে গেছে। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) জানতেন, বরীরা তাঁর খাওয়ার কথা জানতে পারলে আনন্দে বাগ বাগ হয়ে যাবেন। এদিক দিয়েই গৃহকর্তা প্রবেশের অনুমতি দেবে জানা থাকলে জিজ্ঞাসা করে প্রবেশ করা জরুরী নয়। জানা না থাকলে জিজ্ঞেস করে ঘরে ঢুকতে হবে। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে ও তাঁর সহচরগণ হযরত বসরীর গৃহে গেলে যা পেতেন, অনুমতি ছাড়াই খেয়ে ফেলতেন। তখন হাসান বসরী এসে এ অবস্থা দেখে বলতেন ঃ আমরা এমনই থাকতাম। বর্ণিত আছে, হযরত হাসান বসরী বাজারে ফলবিক্রেতার দোকানে দাঁড়িয়ে কখনও এই ঝুড়ি থেকে এবং কখনও ঐ ঝুড়ি থেকে শুকনা খোরমা বের করে খাচ্ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে হেশাম বললেন ঃ হে আবু সায়ীদ, পরহেযগারীর ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? এই দোকানদারের মাল তার অনুমতি ছাড়াই খেয়ে যাচ্ছেন? হযরত হাসান বললেন ঃ আমার সামনে খাওয়া সম্পর্কিত আয়াতটি পাঠ কর তো। হেশাম সূরা নূরের আয়াতটি أَوْ صَدِيقِكُمْ পর্যন্ত পাঠ করলেন এবং বললেন ঃ صَدِيق বলে কি বুঝানো হয়েছে? হযরত হাসান বললেন ঃ এমন বন্ধু, যার দ্বারা মন সুখী হয় এবং যার প্রতি অন্তরের প্রশস্তি থাকে। একবার কিছু লোক হযরত সুফিয়ান সওরীর গৃহে গিয়ে তাঁকে পেলেন না। তারা ঘরের দরজা খুলে দস্তরখান নামিয়ে খেতে লাগলেন। ইতিমধ্যে সুফিয়ান সওরী এসে গেলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে বুযুর্গগণের অভ্যাস স্মরণ করিয়ে দিলে। তাঁরাও এমনি করতেন। একবার কিছু লোক জনৈক তাবেয়ীর সাথে দেখা করতে গেল। তখন তাঁর কাছে খাওয়ার কিছুই ছিল না। তিনি এক বন্ধুর ঘরে গেলেন। বন্ধু ঘরে ছিলেন না। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন, ব্যঞ্জন ও রুটি প্রস্তুত রয়েছে। তিনি সবগুলো এনে মেহমানদের সামনে রেখে দিলেন। বন্ধু বাড়ী ফিরে কিছুই পেলেন না। লোকেরা তাকে জানাল, অমুক ব্যক্তি নিয়ে গেছেন। তিনি বললেন ঃ ভালই করেছেন। পরে বন্ধুর সাথে দেখা হলে তাবেয়ী বললেন ঃ ভাই, তোমার মেহমান এলে আমার ঘরে যা পাও, নিয়ে যেয়ো।

এখন খানা পেশ করার আদব শুনুন। প্রথম কথা হচ্ছে, লৌকিকতা করবে না। যা উপস্থিত থাকে সামনে পেশ করে দেবে। কিছুই না থাকলে এবং পয়সাও না থাকলে এজন্যে ধার করবে না। যদি খানা থাকে কিন্তু তা পেশ করতে মন না চায়, তবে পেশ করবে না। জনৈক বুযুর্গ এক দরবেশের কাছে গেলেন। দরবেশ তখন খানা খাচ্ছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন ঃ যদি আমি এই খাদ্য ধার করে না আনতাম, তবে তোমাকেও খাওয়াতাম। জনৈক বুযুর্গের মতে লৌকিকতা হচ্ছে ধার করা খাদ্য দর্শনার্থীকে খাওয়ানো। ফুযায়ল বলতেন ঃ লোকেরা লৌকিকতার কারণে পারস্পরিক দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করে দিয়েছে। এক ব্যক্তি তার ভাইকে দাওয়াত করে লৌকিকতা প্রদর্শন করে। এ কারণে সে পুনরায় তার কাছে আসে না। জনৈক বুযুর্গ বলেন কোন বন্ধু আমার কাছে এলে তা আমার জন্যে মোটেই কঠিন হয় না। কারণ, আমি তার জন্যে লৌকিকতা করলে এর অর্থ হবে, আমি বন্ধুর আগমনকে খারাপ মনে করি এবং বিরক্তিবোধ করি। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি বন্ধুর কাছে যেতাম। একদিন তাকে বললাম ঃ তুমি একা এরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য খাও না। আমিও খাই না। তা হলে আমরা একত্রে খেলে এরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য হবে কেন? এখন থেকে হয় তুমি লৌকিকতা পরিহার করবে, না হয় আমি এখানে আসা বন্ধ করে দেব। দু'টির একটি হওয়া উচিত। বন্ধুবর লৌকিকতা পরিহার করলেন এবং আমরা আজীবন একত্রে বসবাস করলাম। গৃহে যা কিছু থাকে সমস্তই পেশ করে দেয়া এবং পরিবার-পরিজনের জন্যে কিছু না রাখাও লৌকিকতা পরিহারের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে দাওয়াত করলে তিনি তিনটি শর্তে দাওয়াত কবুল করলেন– (১) বাজার থেকে তাঁর জন্যে কিছু আনা যাবে না, (২) গৃহে যা আছে তা পেশ করতে বিরত না থাকা এবং (৩) পরিবার-পরিজনের জন্যে না রেখে পেশ করা যাবে না।

জনৈক বুযুর্গ গৃহে যত প্রকার খাদ্য থাকত, প্রত্যেক প্রকার থেকে কিছু কিছু পেশ করতেন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমরা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্র কাছে গেলে তিনি আমাদের সামনে রুটি ও সিরকা পেশ করে

বললেন ঃ লৌকিকতা নিষিদ্ধ না হলে আমি তোমাদের জন্যে লৌকিকতা করতাম। অন্য এক বুযুর্গ বলেন ঃ কেউ স্বেচ্ছায় তোমার সাথে দেখা করতে এলে যা উপস্থিত থাকে, তাই পেশ করবে। আর যদি তাকে দাওয়াত করে আন তবে তোমার পক্ষে যা সম্ভব তাতে ত্রুটি রাখবে না। হযরত সালমান (রাঃ) বলেন ঃ আমাদের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আদেশ, আমরা যেন মেহমানের জন্যে এমন বস্তু যোগাড় করতে সচেষ্ট না হই, যা আমাদের কাছে নেই; যা মৌজুদ থাকে, তাই যেন আমরা মেহমানের সামনে পেশ করি।

দ্বিতীয় আদব হচ্ছে, মেযবানের কাছে কোন নির্দিষ্ট খাদ্যের ফরমায়েশ করবে না। কেননা, মাঝে মাঝে ফরমায়েশকৃত বস্তু উপস্থিত করা কঠিন হয়। মেযবান যদি দু'খাদ্যের মধ্যে একটি পছন্দ করতে বলে তবে যেটি সহজলভ্য, সেটি পছন্দ করবে। এটাই সুন্নত। হাদীসে বর্ণিত আছে- রসূলে করীম (সাঃ)-কে যখনই দুটি বিষয়ের মধ্য থেকে একটি পছন্দ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তিনি সহজলভ্যটিই পছন্দ করেছেন। হযরত আবু ওয়ায়েল বলেন ঃ আমি এক বন্ধুকে সাথে নিয়ে হযরত সালমান (রাঃ)-এর সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি আমাদের সামনে যবের রুটি এবং কিছু বিস্বাদ নিমক পেশ করলেন। আমার বন্ধু বলল ঃ এই নিমকের সাথে পুদিনা হলে চমৎকার হত। হ্যরত সালমান (রাঃ) বাইরে গেলেন এবং নিজের ওযুর লোটা বন্ধক রেখে পুদিনা আনলেন। আহার সমাপনান্তে আমার বন্ধু বলল ঃ সেই আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে তাঁর দেয়া রুজিতে অল্পে তুষ্টি দান করেছেন। হযরত সালমান বললেন ঃ যদি আল্লাহর দেয়া রুজিতে তুমি সন্তুষ্ট থাকতে, তবে আমার লোটা বন্ধক রাখতে হত না। এই নির্দিষ্ট খাদ্যের ফরমায়েশ না করা তখন, যখন মেহমান জানে, মেযবানের জন্যে এটি সরবরাহ করা কঠিন হবে অথবা সে ফরমায়েশকে খারাপ মনে করবে। আর যদি জানে ফরমায়েশ করলে মেযবান খুশী হবে এবং খাদ্যটিও সহজলভ্য, তবে এমতাবস্থায় ফরমায়েশ করা নিষিদ্ধ নয়। হযরত ইমাম শাফেয়ী বাগদাদে জাফরানীর গৃহে অবস্থানকালে এরূপ করেছিলেন। জাফরানীর নিয়ম ছিল, যত প্রকার খাদ্য তৈরী করা হত তার একটি তালিকা লেখে বাঁদীর হাতে

দিয়ে দিত। একদিন সেই তালিকা ইমাম শাফেয়ী নিয়ে নিজের কলম দ্বারা এক প্রকার খাদ্য অতিরিক্ত লেখে দিলেন। জাফরানী দস্তরখানে সেই খাদ্য দেখে বলল ঃ আমি তো এর অনুমতি দেইনি। এর পর সেই তালিকা সামনে এল, যাতে ইমাম শাফেয়ী নিজে লেখে দিয়েছিলেন। জাফরানী তাঁর লেখা দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে গেল। আনন্দের আতিশয্যে সে বাঁদীকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে দিল। ইমাম শাফেয়ী ফরমায়েশ করেছেন- এটাই ছিল তার আনন্দের কারণ।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আহার তিন প্রকার- (১) ফকীরদের সাথে আহার করা। এ সময় তাদেরকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। (২) ভাই-বন্ধুদের সাথে আহার করা। এসময় ক্রীড়া কৌতুক সহকারে খাওয়া ভাল। (৩) দুনিয়াদারদের সাথে খাওয়া। তাদের সাথে আদব সহকারে খাওয়া উচিত।

তৃতীয় আদব হচ্ছে, মেযবান মেহমান ভাইকে ফরমায়েশ করার অনুরোধ করবে, অতঃপর তার ফরমায়েশ পূর্ণ করবে। এটা খুব ভাল কথা এবং এতে সওয়াব ও ফযীলত অনেক। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে, তার মাগফেরাত হবে। আর যে তার মুসলমান ভাইকে তুষ্ট করে, সে যেন আল্লাহ্ তাআলাকে তুষ্ট করে। হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার ভাইকে সেই বস্তু খাওয়ায়, যা সে চায়, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে দশ লক্ষ সওয়াব লেখেন এবং দশ লক্ষ পাপ তার আমলনামা থেকে দূর করে দেন। এছাড়া তার দশ লক্ষ মর্তবা উচ্চ করে দেন এবং তাকে ফেরদাউস, আদন ও খালা এই তিন জান্নাত থেকে খেতে দেন।

চতুর্থ আদব, আগন্তুককে একথা বলবে না যে, আপনার জন্যে খানা আনব কিনা; বরং খানা মৌজুদ থাকলে জিজ্ঞাসা না করেই তা সামনে পেশ করবে। সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ তোমার ভাই তোমার সাথে দেখা করতে এলে তাকে একথা বলো না যে, কিছু খাবে অথবা খানা আনব? বরং জিজ্ঞাসা ব্যতিরেকেই খানা সামনে রেখে দাও। খেলে ভাল, নতুবা ফেরত নিয়ে যাবে। যদি খাওয়ানোর উদ্দেশ্য না থাকে, তবে তার সামনে

খাওয়ার কথা বর্ণনা করা উচিত নয়। হযরত সুফিয়ান বলেন ঃ আপন পরিজনকে নিজের খাদ্য না খাওয়ানোর উদ্দেশ্য থাকলে তাদের সামনে তা উল্লেখ করবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দাওয়াতের আদব

নিম্নে আমরা এ বিষয়বস্তুটি ছয়টি শিরোনামে বর্ণনা করছি ঃ

(১) দাওয়াতের ফযীলত ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ মেহমানের জন্যে লৌকিকতা করো না। এতে তাকে মন্দ মনে করা হবে। যে মেহমানকে মন্দ জ্ঞান করে, সে আল্লাহকে মন্দ জ্ঞান করে। আল্লাহ তাআলা তা পছন্দ করেন না। এক হাদীসে বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি মেহমানের আপ্যায়ন করে না, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ব্যক্তির বাড়ীতে গেলেন। তার কাছে অনেক উট-গরু ছিল, কিন্তু সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আপ্যায়ন করল না। এর পর তিনি এক মহিলার গৃহে গেলেন। তার কাছে ছাগপাল ছিল। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে একটি ছাগল যবেহ করল। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে বললেন ঃ এ দুই ব্যক্তির তফাৎ দেখ। এই চরিত্র আল্লাহ্ তাআলার আয়ত্তাধীন। তিনি যাকে সদাচার দিতে ইচ্ছা করেন, দিয়ে দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুক্ত গোলাম আবু রাফে বর্ণনা করেন– একবার রসূলে পাক (সাঃ)-এর গৃহে মেহমান আগমন করলে তিনি আমাকে বললেন, অমুক ইহুদীর কাছে গিয়ে বল, আমার এখানে মেহমান এসেছে। আমাকে যেন কিছু আটা ধার দেয়। ইহুদী বলল ঃ আল্লাহর কসম, কোন বস্তু বন্ধক না রাখলে আমি ধার দেব না। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একথা জানালে তিনি বললেন ঃ আমি আকাশে বিশ্বস্ত এবং পৃথিবীতে বিশ্বস্ত। সে আমাকে ধার দিলে অবশ্যই তা শোধ করতাম। আমার লৌহবর্মটি নিয়ে যাও এবং তার কাছে বন্ধক রাখ। হযরত ইবরাহীম (আঃ) মেহমান ব্যতীত আহার করতেন না। তিনি আহারের পূর্বে এক দুই ক্রোশ পর্যন্ত পথ চলে মেহমান তালাশ করতেন। এ

কারণেই তাঁর ডাকনাম হয়ে যায় "আবুয যায়ফান" (মেহমানওয়ালা)। তিনি খাঁটি নিয়তে মেহমানকে আপ্যায়ন করতেন বিধায় আজ পর্যন্ত মাকামে ইবরাহীমে অতিথিপরায়ণতা অব্যাহত রয়েছে। কোন রাত এমন যায় না যে, সেখানে তিন থেকে দশ ও একশ' মেহমান পর্যন্ত আহার না করে। এ মকামের ব্যবস্থাপকরা বলেন– এ পর্যন্ত কোন রাত মেহমান থেকে শূন্য যায়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ ঈমান কি? তিনি বললেন ঃ আহার করানো এবং সালাম চর্চা করা। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, যে গৃহে মেহমান আসে না, তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। দাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কিত অসংখ্য হাদীসের মধ্যে থেকে এ কয়টি উল্লেখ করেই এখন দাওয়াতের আদব বর্ণনা করছি।

প্রথম আদব ঃ মুত্তাকী-পরহেযগারদেরকে দাওয়াত করবে– পাপাচারীদেরকে নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যে-ই দাওয়াত করেছে, তিনি তার জন্যে এই দোয়া করেছেন– তোমার খাদ্য সৎলোকদের আহার্য হোক। এক হাদীসে আছে– পরহেযগার লোকদের ছাড়া অন্য কারও খাদ্য খাবে না। তোমার খাদ্যও যেন মুত্তাকী ছাড়া অন্য কেউ না খায়।

দ্বিতীয় আদব ঃ বিশেষভাবে ধনীদের দাওয়াত করবে না, বরং ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইকে দাওয়াত করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ সেই ওলীমার খাদ্য সকল খাদ্যের মধ্যে নিকৃষ্ট, যাতে কেবল ধনীদের দাওয়াত করা হয়, ফকীরদের করা হয় না।

তৃতীয় আদব ঃ দাওয়াতে নিজের আত্মীয়দেরকে বাদ দেবে না। কারণ, তাদেরকে বাদ দিলে তারা বিচলিত হবে এবং আত্মীয়তা ছিন্ন হবে। এমনিভাবে বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত জনের মধ্যে স্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। কতককে অধিক গুরুত্ব দিলে অন্যরা মনঃক্ষুণ্ন হবে।

চতুর্থ আদব ঃ গর্ব অহঙ্কারের নিয়তে দাওয়াত করবে না; বরং ভাইদের অন্তর আকৃষ্ট করা, সুন্নতের অনুসরণ করা এবং ঈমানদারদের মন তুষ্ট করার নিয়তে দাওয়াত করবে।

পঞ্চম আদব ঃ এমন ব্যক্তিকে দাওয়াত করবে না, যার সম্পর্কে জানা আছে যে, দাওয়াত কবুল করা তার জন্যে কঠিন।

ষষ্ঠ আদব ঃ এমন ব্যক্তিকেই দাওয়াত করবে, যার দাওয়াত কবুল

করা দাওয়াতকারী ভাল বলে জানে। হযরত সুফিয়ান বলেন ঃ যে ব্যক্তি কাউকে দাওয়াত করে অথচ তার দাওয়াত কবুল করা মনে মনে খারাপ জানে, তার দাওয়াত একটি গোনাহ। অপর পক্ষে এ দাওয়াত কবুল করলে তার উপর দু'গোনাহ হবে।

মুত্তাকী ব্যক্তিকে খাওয়ালে তার তাকওয়ায় এবং পাপাচারীকে খাওয়ালে তার পাপাচারে শক্তি যোগানো হয়। জনৈক দর্জি হযরত ইবনে মোবারককে জিজ্ঞেস করল ঃ আমি বাদশাহদের কাপড় সেলাই করি। এমতাবস্থায় আমি জালেমদের সাহায্যকারী নই তো? তিনি বললেন ঃ জালেমদের সাহায্যকারী তো তারা, যারা তোমার হাতে সুই-সুতা বিক্রি করে। তুমি তো স্বয়ং জালেম। সাহায্যকারী হওয়ার কথা কি জিজ্ঞেস কর?

দাওয়াত কবুল করা ঃ দাওয়াত কবুল করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। কতক জায়গায় মানুষ একে ওয়াজিবও বলে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لو دعيت الى كراع لاجبت ولو اهدى الى ذراع لقبلت -

অর্থাৎ, যদি আমাকে কেউ ছাগলের পায়ের হাড় খেতে দাওয়াত করে, তবুও আমি অবশ্যই তাতে সাড়া দেব, আর যদি কেউ আমাকে খাসীর বাহু হাদিয়া দেয়, তবে আমি তা কবুল করব।

দাওয়াত কবুল করার আদব পাঁচটি ঃ

১। (ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য করবে না; অর্থাৎ, এমন যেন না হয় যে, ধনী দাওয়াত দিলে কবুল করবে এবং দরিদ্র দাওয়াত দিলে কবুল করবে না। এটা অহংকার বিধায় নিষিদ্ধ। এই অহংকারের কারণে অনেকে দাওয়াত কবুল করাই বাদ দিয়েছে। তারা বলে ঃ শুরবার অপেক্ষায় বসে থাকা একটি যিল্লতীর কাজ। কোন কোন অহংকারী আবার ধনীদের দাওয়াত কবুল করে এবং দরিদ্রের করে না। এটাও সুন্নতের খেলাফ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) গোলাম, মিসকীন সকলের দাওয়াতই কবুল করতেন। একবার হযরত হাসান (রাঃ) কয়েকজন মিসকীনের কাছ দিয়ে গমন করেন। তারা তখন রুটির টুকরা মাটিতে ছড়িয়ে রেখে সকলেই বসে খাচ্ছিল। হযরত হাসান খচ্চরে সওয়ার হয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম করলেন। তারা সালামের জওয়াব দিয়ে বলল ঃ হে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৌহিত্র, আসুন খানা খান। তিনি বললেন ঃ ভাল কথা, আল্লাহ

তা'আলা অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না। একথা বলে তিনি খচ্চর থেকে নামলেন এবং তাদের সাথে মাটিতে বসে আহার করলেন। এর পর সালাম করে খচ্চরে সওয়ার হলেন এবং বললেন ঃ আমি তোমাদের দাওয়াত কবুল করেছি। তোমরাও আমার দাওয়াত কবুল কর। তারা বলল ঃ উত্তম। তিনি তাদেরকে একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন। তারা সেদিন আগমন করলে তিনি উৎকৃষ্ট খাদ্য তাদের সামনে পেশ করেন এবং নিজেও তাদের সাথে বসে খেলেন।

যারা দাওয়াতকে যিল্লতীর কাজ বলে, তাদের জওয়াব, এটা সুন্নত বিরোধী কথা। বাস্তবে এরূপ নয়। কেননা, দাওয়াত কবুল করা তখনই যিল্লতী, যখন দাওয়াতকারী দাওয়াত কবুল করলে সন্তুষ্ট এবং অনুগ্রহভাজন না হয়; বরং দাওয়াতকে অন্যের উপর অনুগ্রহ মনে করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাওয়াতে যাওয়ার কারণ এটাই ছিল যে, তিনি জানতেন, দাওয়াতকারী অনুগ্রহ স্বীকার করবে এবং ইহকাল পরকালে নিজের গৌরব ও মর্যাদা মনে করবে।

মোট কথা, দাওয়াত কবুল করার বিধান অবস্থাভেদে বিভিন্নরূপ। যদি মনে হয়, দাওয়াতকারী আহার করানো বোঝা মনে করে এবং কেবল গর্ব ও লৌকিকতার খাতিরে দাওয়াত করে, তবে তার দাওয়াত কবুল করা সুন্নত নয়; বরং কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া উত্তম। জনৈক সুফী এরশাদ করেন ঃ এমন ব্যক্তির দাওয়াত খাও, যে মনে করে তুমি তোমার রিযিক খাচ্ছ এবং তোমার যে আমানত তাঁর কাছে ছিল, তা সে প্রত্যর্পণ করে অনুগ্রহভাজন হচ্ছে। সিররী সকতী (রহঃ) বলেন ঃ আমি এমন লোকমা অন্বেষণ করি, যাতে কোন গোনাহ আমার উপর না বর্তায় এবং কোন মানুষের অনুগ্রহ না থাকে। আবু তোরাব বখশী বলেন ঃ একবার আমার সামনে খাদ্য এলে আমি তা খেতে অস্বীকার করলাম। এর পর চৌদ্দ দিন ভুখা থাকতে হল। তখন জানলাম, এটা সেই অস্বীকারের শাস্তি।

(২) বেশী দূরে হওয়ার কারণে দাওয়াত খেতে অস্বীকার করবে না; যেমন দাওয়াতকারী নিঃস্ব হলে অস্বীকার করা উচিত নয়। বরং যতটুকু দূরত্ব সহ্য করার অভ্যাস আছে, ততটুকু দূরত্বে দাওয়াত হলে অস্বীকার করবে না। তওরাতে অথবা অন্য কোন ঐশী গ্রন্থে আছে– এক মাইল হেঁটে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস কর, দুই মাইল চলে জানাযার সঙ্গে থাক, তিন মাইল চলে দাওয়াত কবুল কর এবং চার মাইল চলে এমন ভাইয়ের

সাথে সাক্ষাত কর, যে আল্লাহর সূত্রে ভাই। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যদি কেউ কোরাউল গামীমে আমাকে দাওয়াত করে, তবে আমি তা কবুল করব। কোরাউল গামীম মদীনা থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযানে সেখানে পৌঁছে ইফতার করেছিলেন এবং সফরে এ স্থানেই নামাযে কসর করেছিলেন।

(৩) রোযাদার হওয়ার কারণে দাওয়াত অস্বীকার করবে না; বরং দাওয়াতে যাবে। যদি রোযা ভঙ্গ করলে দাওয়াতকারী খুশী হয়, তবে রোযা ভঙ্গ করবে। মুসলমানকে খুশী করার ইচ্ছায় রোযা ভঙ্গ করার মধ্যেও সেই সওয়াব কামনা করবে, যা রোযা রাখলে হত। এ বিধান নফল রোযার ক্ষেত্রে, কিন্তু যদি জানা যায়, সে লৌকিকতা প্রদর্শন হেতু রোযা ভঙ্গ করতে বলছে, তবে এড়িয়ে যাবে এবং রোযা ভঙ্গ করবে না। এক ব্যক্তি রোযার ওযর দেখিয়ে দাওয়াত খেতে অস্বীকার করেছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বলেছিলেন ঃ তোমার ভাই তোমার জন্যে মেহনত করেছে, আর তুমি বলছ, তুমি রোযাদার। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ বন্ধু-বান্ধবের খাতিরে রোযা ভঙ্গ করা খুব চমৎকার পুণ্যের কাজ। সুতরাং এ নিয়তে রোযা ভঙ্গ করা এবাদত ও সদাচার বিধায় এ সওয়াব রোযার সওয়াবের চেয়ে বেশী।

(৪) যদি খাদ্য সন্দেহযুক্ত হয়, অথবা বিছানা হালাল উপায়ে উপার্জিত না হয়, অথবা রেশমী বিছানা হয়, অথবা থালা-বাসন রূপার হয়, অথবা প্রাণীর চিত্র ছাদে কিংবা প্রাচীরে লাগানো থাকে অথবা সেতার বাঁশী ও ক্রীড়া কৌতুকের সাজ-সরঞ্জাম থাকে অথবা গীবত, পরনিন্দা, অপবাদ, মিথ্যা ও প্রতারণা শুনতে হয়, অথবা এমনি প্রকার কোন বেদআত থাকে, তবে এসব কারণে দাওয়াত কবুল করবে না। এমতাবস্থায় দাওয়াত কবুল করা মোস্তাহাব থাকে না; বরং এসব বিষয়ের সম্ভাবনা থাকলে দাওয়াত হারাম ও মাকরূহ হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। দাওয়াতকারী জালেম, বেদআতী, ফাসেক অথবা দুষ্ট প্রকৃতির লোক হলেও একই বিধান।

(৫) এক বেলা পেট ভরে খাবে দাওয়াত এই উদ্দেশে হওয়া উচিত নয়। এরূপ উদ্দেশ্য থাকলে এটা দুনিয়ার জন্যে আমল হবে। বরং দাওয়াত কবুল করার মধ্যে নিয়ত সঠিক রাখবে, যাতে আমলটি বিশেষভাবে আখেরাতের জন্যে হয়ে যায়। সঠিক নিয়ত অনেক প্রকারে

হতে পারে। উদাহরণতঃ সুন্নত অনুসরণের নিয়ত করবে অথবা এই নিয়ত করবে যে, দাওয়াত কবুল করলে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী থেকে বেঁচে যাব। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ من لم يجب الداعى فقد عصى الله ورسوله যে দাওয়াত কবুল করে না, সে আল্লাহ্ ও রসূলের নাফরমানী করে। অথবা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এরশাদ অনুযায়ী মুসলমান ভাইকে সম্মান করার নিয়ত করবে। কেননা, তিনি বলেন ঃ من اكرم اخاه المؤمن فكانما اكرم الله যে ব্যক্তি মুমিনকে সম্মান করে সে যেন আল্লাহকে সম্মান করে। অথবা মুমিনের মন সন্তুষ্টির নিয়ত করবে। যেমন হাদীসে আছে من سر مؤمنا فقد سر الله – যে মুমিনকে সন্তুষ্ট করে সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। অথবা এই নিয়ত করবে যে, দাওয়াত কবুল করলে কেউ তার প্রতি কুধারণা পোষণ করবে না এবং মুসলমানকে হেয় মনে করে দাওয়াত কবুল করেনি– এরূপ অপবাদ আরোপ করবে না। মোট কথা, এসবের মধ্যে যেকোন একটির নিয়ত করলে দাওয়াত করা এবাদতরূপে গণ্য হবে। আর যদি কেউ সবগুলো নিয়ত করে, তবে তা আরও উত্তম। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ বলতেন ঃ আমি চাই, আমার প্রত্যেক আমলে একটি নিয়ত হোক, এমন কি পানাহারের মধ্যেও নিয়ত হোক। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه.

অর্থাৎ, আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পায় যা সে নিয়ত করে। অতএব যার হিজরত আল্লাহ ও রসূলের দিকে হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও রসূলের দিকেই থাকবে। আর যার হিজরত দুনিয়া পাওয়ার দিকে অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার দিকে হবে, তার হিজরত তার দিকেই থাকবে, যার জন্যে সে হিজরত করবে।

নিয়ত কেবল আনুগত্য ও বৈধ কাজের মধ্যেই ফলদায়ক হয়–

নিষিদ্ধ কাজে ফলদায়ক হয় না। উদাহরণতঃ কেউ যদি সঙ্গীদেরকে খুশী করার নিয়তে মদ্যপান করে অথবা অন্য কোন হারাম কাজ করে, তবে এই নিয়ত উপকারী হবে না এবং এখানে একথা বলা ঠিক হবে না যে, আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। বরং যে জেহাদ একটি আনুগত্যের কাজ, তাতেও যদি কেউ গর্ব অথবা অর্থোপার্জনের নিয়ত করে, তবে তা আনুগত্যের কাজ থাকবে না।

দাওয়াত খাওয়ার জন্যে উপস্থিতির আদব ঃ প্রথমতঃ গৃহে এসে প্রধান স্থানে উপবেশন করবে না; বরং বিনয় প্রকাশ করবে। দ্বিতীয়তঃ উপস্থিত হতে অধিক দেরী করবে না যে, মানুষ অপেক্ষায় বসে থাকবে এবং এত শীঘ্রও আসবে না যে, দাওয়াতের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করা সমাপ্তও না হয়। তৃতীয়তঃ ভিড়ের সময় এমনভাবে বসবে না যাতে অন্যের অসুবিধা হয়। বরং গৃহকর্তা কোথাও বসতে ইশারা করলে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে না। যদি উপস্থিত কেউ তাযীমের জন্যে কোন উঁচু জায়গা বলে দেয়, তবে তখন বিনয় করা উচিত।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

ان من التواضع لله الرضاء بالدون من المجلس ـ

আল্লাহর জন্যে বিনয় এটাও যে, তুমি বসার জায়গা থেকে নিম্নস্তরে বসতে রাজি হয়ে যাবে। চতুর্থতঃ যে কক্ষে মহিলারা রয়েছে এবং পর্দা ঝুলানো রয়েছে, তার দরজার সামনে বসবে না। পঞ্চমতঃ যে জায়গায় খাদ্য এনে রাখা হয়, সেদিকে বেশী তাকাবে না। কারণ, এটা অধৈর্য ও লোভের পরিচায়ক। ষষ্ঠতঃ বসার সময় যে কাছে থাকে; তাকে সালাম করবে ও কুশল জিজ্ঞেস করবে। মেযবান মেহমানকে কেবলার দিক, পায়খানা ও ওযুর জায়গা বলে দেয়া উচিত। হযরত ইমাম মালেক হযরত ইমাম শাফেয়ীর সাথে তাই করেছিলেন। হযরত ইমাম মালেক খাওয়ার পূর্বে সর্বপ্রথম নিজে হাত ধৌত করেন এবং বলেন ঃ খাওয়ার পূর্বে প্রথমে গৃহকর্তার হাত ধোয়া উচিত। কেননা, সে মানুষকে দাওয়াত করে। তাই প্রথমে সে হাত ধুয়ে সকলকে খাওয়া শুরু করতে সাহায্য করবে, কিন্তু খাওয়া শেষে গৃহকর্তা সকলের পরে হাত ধুবে। সপ্তমতঃ দাওয়াতের স্থানে পৌঁছে গর্হিত কোন কিছু দেখলে যদি তা বন্ধ করতে সমর্থ হয় তবে বন্ধ করে দেবে। নতুবা মুখে তার নিন্দা বর্ণনা করে ফিরে যাবে। গর্হিত বিষয়

এগুলো ঃ রেশমী বিছানা, সোনা রূপার পাত্র ব্যবহার, প্রাচীরে চিত্র থাকা, গান বাজনা হওয়া, মহিলাদের খোলা মুখে উপস্থিতি ইত্যাদি, কিন্তু প্রাচীরে শোভা বর্ধনের জন্যে রেশমী কাপড় ঝুলানো হারাম নয়। কেননা, রেশমী বস্ত্র পরিধান করা পুরুষদের জন্যে হারাম।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

هذان حرام على ذكور امتى حل لاناثها এগুলো আমার উম্মতের পুরুষদের জন্যে হারাম এবং মহিলাদের জন্যে হালাল। প্রাচীরে রেশমী বস্ত্র থাকলে তা পুরুষদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয় না। প্রাচীর গাত্রে রেশমী বস্ত্র হারাম হলে কাবা শরীফের সৌন্দর্য বর্ধনও হারাম হত। কাজেই একে মোবাহ্ বলা উত্তম।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ বলুন, আল্লাহর সৌন্দর্য কে নিষিদ্ধ করল?

খাদ্য আনার আদব ঃ প্রথমতঃ খাদ্য দ্রুত আনবে। এতে মেহমানের তাযীম হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের তাযীম করে। অধিকাংশ মেহমান এসে গেলে এবং দু'একজন অনুপস্থিত থাকলে উপস্থিতদের খাতিরে দ্রুত খাদ্য পেশ করা অনুপস্থিতদের খাতিরে বিলম্বে খাওয়ানোর চেয়ে উত্তম। হাঁ, অনুপস্থিত ব্যক্তি ফকীর হলে অথবা পেছনে থেকে গেলে সে মনঃক্ষুণ্ণ হবে মনে হলে তার অপেক্ষা করায় দোষ নেই।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ -এর এক অর্থ এরূপও নেয়া হয়েছে যে, তাদের সামনে দ্রুত খাদ্য পেশ করাই ছিল তাদের তাযীম। অন্য একটি আয়াত এর দলীল। বলা হয়েছে ঃ

فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاۤءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ অর্থাৎ, অতঃপর অবিলম্বে একটি ভাজা করা বাছুর নিয়ে এল। অন্যত্র বলা হয়েছে–

فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَاۤءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ অর্থাৎ, সে গৃহাভ্যন্তরে

দৌড়ে গেল, নিয়ে এল একটি ঘৃতপক্ক বাছুর। এখানে راغ বলে দ্রুত যাওয়া বুঝানো হয়েছে।

কথিত আছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) মাংসের একটি রান এনেছিলেন, কিন্তু দ্রুত এনেছিলেন বিধায় তাকে عجل বলা হয়েছে। হযরত হাতেম আসাম্ম (রঃ) বলেন ঃ পাঁচটি বিষয় ছাড়া তড়িঘড়ি করা শয়তানের কাজ। পাঁচটি বিষয় এই ঃ মেহমানকে খাওয়ানো, মৃতের কাফন দাফন করা, কুমারী কন্যাকে বিবাহ দেয়া, ঋণ শোধ করা এবং গোনাহ থেকে তওবা করা। এ পাঁচটি বিষয়ে তড়িঘড়ি করা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নত। দ্বিতীয়তঃ ক্রম অনুযায়ী খাদ্য পেশ করবে; অর্থাৎ, ফলমূল থাকলে তা প্রথমে পেশ করবে। কেননা, ফলমূল দ্রুত হজম হয় বিধায় এটা পাকস্থলীতে নীচে থাকার যোগ্য। কোরআন মজীদে বলা হয়েছে– وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ (এবং তাদের পছন্দনীয় ফলমূল), এ বাক্যেও বলা হয়েছে যে, ফলমূল প্রথমে পেশ করা উচিত। এর পর বলা হয়েছে– وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ আর পাখীর মাংস, যা তারা কামনা করবে। ফলমূলের পরে মাংস ও ছরীদ পেশ করা উত্তম। শুরবার সাথে রুটির টুকরা মিশ্রিত করে ছরীদ প্রস্তুত করা হয়। আরবে এ খাদ্য উৎকৃষ্ট খাদ্য হিসাবে গণ্য। হাদীসে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) মহিলাদের মধ্যে এমন শ্রেষ্ঠ, যেমন অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে ছরীদ। সকল খাদ্যের পরে কিছু মিষ্টান্ন হলে যাবতীয় উৎকৃষ্ট খাদ্যের সমাবেশ হয়ে যায়। উৎকৃষ্ট খাদ্যের ব্যাপারে কোরআনে এরশাদ হয়েছে– أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى (আমি তোমাদের প্রতি মান্না ও সালওয়া নাযিল করেছি।) এতে মান্না অর্থ মধু এবং সালওয়া বলে গোশত বুঝানো হয়েছে। গোশতকে সালওয়া বলার কারণ, গোশত থাকলে অন্য ব্যঞ্জন থেকে সান্ত্বনা (সালওয়ার আভিধানিক অর্থ) হয়ে যায় এবং অন্য কোন কিছু তার স্থলাভিষিক্ত হয় না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ سيد الادم لحم অর্থাৎ, গোশত ব্যঞ্জনের সর্দার। মান্না ও সালওয়া উল্লেখ করার পর আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ তোমরা আমার প্রদত্ত পরিচ্ছন্ন বস্তুসমূহ ভক্ষণ কর। এ থেকে বুঝা গেল, মিষ্টান্ন ও গোশত উভয়টিই উৎকৃষ্ট খাদ্য।

তৃতীয়তঃ খাদ্যের প্রকারসমূহের মধ্যে যেটি অধিক সুস্বাদু, সেটি প্রথমে পেশ করবে, যাতে যার ইচ্ছা, সে এটি পুরাপুরি খেয়ে নেয়। পূর্ববর্তীদের নিয়ম ছিল, তাঁরা সকল প্রকার খাদ্য একযোগে এনে রাখতেন, যাতে প্রত্যেকেই পছন্দসই খাদ্য খেতে পারে। গৃহকর্তার কাছে এক প্রকার ছাড়া অন্য খাদ্য না থাকলে সে তা বলে দিত, যাতে মেহমানরা তৃপ্ত হয়ে খেয়ে নেয় এবং কখনও উৎকৃষ্ট খাদ্যের অপেক্ষায় না থাকে। জনৈক শায়খ বলেন ঃ আমার সামনে সিরিয়ার জনৈক শায়খ এক প্রকার খাদ্য পেশ করলে আমি বললাম ঃ আমাদের ইরাকে এ খাদ্য সকলের শেষে পেশ করা হয়। তিনি বললেন ঃ আমাদের সিরিয়াতেও তাই নিয়ম। আসলে তিনি অন্য কোন প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করাননি। তাই আমি খুব লজ্জা পেলাম। অন্য একজন বলেন ঃ আমরা কিছু সংখ্যক লোক এক দাওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। গৃহকর্তা ছাগলের ভাজা করা মাথা শুরবাসহ পেশ করলেন। আমরা অন্য খাদ্য অথবা গোশতের অপেক্ষায় সেটি খেলাম না, কিন্তু অবশেষে গৃহকর্তা আমাদের সামনে হাত ধোয়ার পাত্র পেশ করলেন। তখন আমরা একে অপরের মুখ পানে তাকাতে লাগলাম। জনৈক রসিক বলে ফেললেন ঃ শরীর ছাড়া মাথা সৃষ্টি করার ক্ষমতা আল্লাহ্ তাআলারই রয়েছে। সে রাত আমরা ক্ষুধার্তই রয়ে গেলাম। এদিক দিয়ে সকল প্রকার খাদ্য একযোগে পেশ করা অথবা যা আছে তা বলে দেয়া মোস্তাহাব, যাতে মেহমানরা অপেক্ষা না করে।

চতুর্থতঃ যে পর্যন্ত মেহমান সকল প্রকার খাদ্য ভালরূপে খেয়ে হাত গুটিয়ে না নেয়, সে পর্যন্ত থালা তুলে নেয়া উচিত নয়। কেননা, কারও কারও হয় তো শেষে আসা খাদ্যটি পূর্বেকার খাদ্যসমূহের তুলনায় অধিক প্রিয় হতে পারে, অথবা তখনও তৃপ্ত না হয়ে আসতে পারে। থালা তুলে নিলে তাদের অসুবিধা হবে। সন্তোরী ছিলেন রসিক সুফী। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি জনৈক দুনিয়াদার কৃপণের বাড়ীতে দাওয়াত খেতে যান। একটি ভাজা করা খাসী সামনে এলে মেহমানরা সেটি খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে। তা দেখে কৃপণ গৃহকর্তা অস্থির হয়ে গোলামকে বলে ঃ এই খাসীটি ছেলেদের জন্যে তুলে নিয়ে যা। গোলাম সেটি তুলে নিয়ে অন্দরে যেতে থাকলে সন্তোরী তার পেছনে পেছনে দৌড় দিলেন। কেউ জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন, সন্তোরী বললেন ঃ ছেলেদের সাথে খাব। তখন গৃহকর্তা লজ্জিত হয়ে খাসীটি ফিরিয়ে আনল।

পঞ্চমতঃ এই পরিমাণ খাদ্য পেশ করবে। যা সকলের জন্যে যথেষ্ট হয়, কেননা, পর্যাপ্ত পরিমাণের কম পেশ করলে ভদ্রতা কলুষিত হবে এবং বেশী করলে বানোয়াট ও যশের জন্যে হবে; বিশেষতঃ যখন সবগুলো খেয়ে ফেলা মনে মনে পছন্দনীয় না হয়।

অবশ্য যদি অনেক খাদ্য এভাবে পেশ করে যে, সবগুলো খেয়ে ফেললে গৃহকর্তা খুশী হবে এবং কিছু রেখে দিলে বরকত মনে করবে, তবে অনেক খাদ্য পেশ করায় দোষ নেই। কেননা, হাদীসে আছে, এ খাদ্যের কোন হিসাব হবে না। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম তাঁর দস্তরখানে অনেক খাদ্য হাযির করেছিলেন। সুফিয়ান সওরী বললেন ঃ হে আবু ইসহাক, এতে অপচয় হবে বলে আপনি আশংকা করেন না? ইবরাহীম বললেন ঃ খাদ্যের ব্যাপারে অপচয় নেই। মোট কথা, এ নিয়তে না হলে খাদ্যের প্রাচুর্য নিঃসন্দেহে লৌকিকতা। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি গর্ব করে খাওয়ায়, তার দাওয়াত কবুল করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। যতটুকু যথেষ্ট, ততটুকু পেশ করার কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্মুখ থেকে কখনও বাড়তি খাদ্য তুলে নেয়া হয়নি। সাহাবায়ে কেরাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য তাঁর সামনে পেশ করতেন না এবং নিজেরাও খুব উদরপূর্তি করে খেতেন না। ফলে অল্প খাদ্যই যথেষ্ট হয়ে যেত। গৃহের লোকজনের জন্যে তাদের অংশ আলাদা করে রাখা উচিত। তাদেরকে যেন মেহমানদের কাছ থেকে উদ্বৃত্তের আশায় বসে থাকতে না হয়। যদি মেহমানের কাছে উদ্বৃত্ত না হয়, তবে তারা মনঃক্ষুণ্ন হবে এবং মেহমানদেরকে মন্দ শুনাবে। মেহমানকে এমন খাদ্য খাওয়ানো জরুরী নয়, যাকে অন্যরা খারাপ মনে করে। এটা মেহমানদের পক্ষে খেয়ানত। উদ্বৃত্ত খাদ্য মেহমানের নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। হাঁ, যদি গৃহকর্তা মনের খুশীতে এর অনুমতি দেয় অথবা ইঙ্গিতদৃষ্টে তার আনন্দিত হওয়া বুঝা যায়, তবে নেয়ায় দোষ নেই। মেযবানের সম্মতি থাকলেও সকল মেহমানের মধ্যে যাতে ইনসাফ সহকারে বন্টন হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেকেই তার সামনের উদ্বৃত্ত খাদ্য নেবে। সঙ্গী রাজি হলে তার সামনের খাদ্যও নিতে পারবে।

দাওয়াত থেকে প্রত্যাবর্তনের আদব ঃ প্রথমতঃ মেযবান মেহমানের সাথে গৃহের দরজা পর্যন্ত যাবে। এটা সুন্নত এবং মেহমানের

তাযীম। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, হাদীসে মেহমানের তাযীম করার নির্দেশ আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মেহমানের সম্মান হচ্ছে গৃহের দরজা পর্যন্ত তার সাথে যাওয়া। হযরত আবু কাতাদা বলেন ঃ আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর দূত রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে আগমন করলে তিনি স্বয়ং তার খেদমত করতে প্রস্তুত হন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা তার খেদমত করব। আপনি কষ্ট করবেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তা হয় না। নাজ্জাশী আমার সহচরদের তাযীম করেছিলেন। তাই আমি এর প্রতিদান দিতে চাই। মেহমানের পূর্ণ তাযীম হচ্ছে তার সামনে হাসিমুখে থাকা এবং আসা যাওয়ার সময় ও দস্তরখানে ভাল কথাবার্তা বলা। আওযায়ীকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ মেহমানের তাযীম কি? তিনি বললেন ঃ হাসিমুখে থাকা ও উৎকৃষ্ট কথাবার্তা বলা। ইয়াযীদ ইবনে আবী যিয়াদ বলেন ঃ আমরা যখনই আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লার কাছে এসেছি, তিনি আমাদের সাথে কথাবার্তাও ভাল বলেছেন এবং খাদ্যও চমৎকার খাইয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ মেহমানের উচিত আদর আপ্যায়ন কম হয়ে থাকলেও মেযবানের কাছ থেকে আনন্দ চিত্তে বিদায় হওয়া। কেননা, এটা সচ্চরিত্র ও বিনয়ের অঙ্গ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষ তার সচ্চরিত্র দ্বারা রোযাদার ও রাত জাগরণকারীর মর্যাদা অর্জন করে নেয়। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের মধ্য থেকে এক বুযুর্গের কাছে এক ব্যক্তি খানা খেয়ে যাওয়ার জন্যে লোক পাঠাল। বুযুর্গ তখন গৃহে ছিলেন না। পরে এসে শুনলেন, অমুক ব্যক্তি ডেকে পাঠিয়েছিল। সেমতে তিনি সেখানে গেলেন। তখন সকল মেহমান খানা খেয়ে চলে গিয়েছিল। গৃহকর্তা তাঁর কাছে এসে বলল ঃ এখন তো খাওয়া দাওয়া শেষ। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিছু বেঁচে গেছে? সে বলল ঃ না। বুযুর্গ বললেন ঃ এক আধ টুকরা রুটি থাকলেও নিয়ে এস। গৃহকর্তা বলল ঃ তাও নেই। বুযুর্গ বললেন ঃ পাতিল নিয়ে এস, মুছে নেই। গৃহকর্তা বলল ঃ পাতিল আমি ধুয়ে ফেলেছি। অতঃপর আল্লাহর শোকর বলে বুযুর্গ সেখান থেকে হাসি খুশী চলে এলেন। লোকেরা বলল ঃ ব্যাপার কি, যে ব্যক্তি আপনাকে কিছু খাওয়াল না, অথচ আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট? বুযুর্গ বললেন ঃ সে আমার সাথে ভাল কথা বলেছে। পরিষ্কার নিয়তেই সে আমাকে ডেকেছিল এবং পরিষ্কার

নিয়তেই বিদায় দিয়েছে। একেই বলে বিনয় ও সচ্চরিত্র । কথিত আছে, ওস্তাদ আবুল কাসেম জুনায়দকে একটি ছেলে চার বার এই বলে ডাকতে গিয়েছিল যে, আমার পিতা আপনাকে খেতে ডেকে পাঠিয়েছেন। ছেলেটির পিতা তাকে চার বারই খাওয়াবে না বলে সাফ জওয়াব দিয়ে দিল, কিন্তু তিনি প্রত্যেকবারই ছেলের কথায় চলে গেলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ছেলেটি এই ভেবে খুশী হবে যে, আমার কথা মেনেছেন এবং তার পিতাও খুশী হবে যে, আমার সাফ জওয়াব শুনে চলে গেছেন। এঁরা ছিলেন পবিত্রাত্মা। আল্লাহর জন্যে বিনয়ে তাঁরা নত হয়ে যেতেন এবং তওহীদ নিয়েই প্রশান্ত থাকতেন। তাঁরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতিই লক্ষ্য করতেন না । কেউ হেয় মনে করলে তাঁরা মনঃক্ষুণ্ন হতেন না এবং কেউ তাযীম করলে প্রফুল্ল হতেন না। বরং প্রত্যেক বিষয়কে তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করতেন। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বলতেন ঃ আমি দাওয়াত কবুল করি। কেননা, এতে জান্নাতের খাদ্য স্মরণ হয়। অর্থাৎ, দাওয়াতের খাদ্যের ন্যায় জান্নাতের খাদ্যও বিনা ক্লেশে অর্জিত হবে এবং তার কোন হিসাব নেয়া হবে না।

তৃতীয়তঃ মেযবানের সম্মতি ও অনুমতি ব্যতীত তার কাছ থেকে চলে যাবে না। সাধ্য পরিমাণে তার মনের দিকে খেয়াল রাখবে। মেহমান হয়ে গেলে তিন দিনের বেশী অবস্থান করবে না। কেননা, মেযবান বিরক্তিবোধ করে চলে যাওয়ার কথা বলার প্রয়োজন হতে পারে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

الضيافة ثلاثة ايام فما زاد صدقة অর্থাৎ, মেহমানী তিন দিন। এর বেশী হলে তা সদকা।

তবে গৃহকর্তা খাঁটি মনে অবস্থান করতে পীড়াপীড়ি করলে অবস্থান করা জায়েয। গৃহকর্তার কাছে মেযবানের জন্যে একটি বিছানা থাকা দরকার। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এক বিছানা স্বয়ং পুরুষের জন্যে, এক বিছানা স্ত্রীলোকের জন্যে, এক বিছানা মেহমানের জন্যে এবং চতুর্থ বিছানা থাকলে তা হবে শয়তানের জন্যে।

(৬) পরিশিষ্ট ঃ ইবরাহীম নখয়ী (রহঃ) বলেন ঃ বাজারে খাদ্য খাওয়া নীচতা। তিনি একে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এর বিপরীতে একটি রেওয়ায়েত হযরত ইবনে ওমর

(রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে চলাফেরা অবস্থায় খাওয়া দাওয়া করে নিতাম। জনৈক ব্যক্তি একজন খ্যাতনামা সুফীকে বাজারে খেতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করল। সুফী বললেন ঃ ক্ষুধা লাগবে বাজারে আর খাব গিয়ে ঘরে– এ কেমন কথা! লোকটি বলল ঃ তা হলে মসজিদে চলে যেতেন? সুফী বললেন ঃ আল্লাহ তাআলার গৃহে খাওয়ার জন্যে যাব– এটা আমার কাছে লজ্জার কথা।

উপরোক্ত পরস্পর বিরোধী দুটি বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হবে যে, যারা বাজারে খাওয়া বিনয় মনে করে, তাদের জন্যে বাজারে খাওয়া ভাল। পক্ষান্তরে যারা একে লজ্জাহীনতা মনে করে, তাদের জন্যে মাকরূহ। সুতরাং এ বিধানটি মানুষের অভ্যাসভেদে বিভিন্ন রূপ হবে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে– যে ব্যক্তি নিমক দিয়ে সকালের খানা শুরু করে, আল্লাহ তাআলা তার উপর থেকে সত্তর প্রকার বালা দূর করে দেন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ একুশটি লাল কিশমিশ খায়, সে তার দেহে খারাপ কোন কিছু দেখবে না। মাংস খেলে মাংস বাড়ে। হালুয়া খেলে পেট বেড়ে যায় এবং অণ্ডকোষ ঝুলে পড়ে। গরুর মাংস রোগ, তার দুধ আরোগ্য, তার ঘি ওষুধ এবং চর্বি দেহ থেকে সমপরিমাণ রোগ দূর করে দেয়। কোরআন মজীদের তেলাওয়াত ও মেসওয়াক শ্লেষ্মা নিবারক। যে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন চায়, সে যেন সকালের খানা প্রাতঃকালে খায়, সন্ধ্যায় কম আহার করে এবং জুতা পরিধান করে।

হাজ্জাজ জনৈক চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করল ঃ আমাকে এমন বিষয় বলে দিন, যা আমি মেনে চলি এবং লঙ্ঘন না করি। চিকিৎসক বলল ঃ মহিলাদের মধ্যে যুবতী ছাড়া কাউকে বিয়ে করবেন না। মাংস কেবল জওয়ান পশুর খাবেন। পাকা কলা ভালরূপে না পাকা পর্যন্ত খাবেন না। রোগ ছাড়া ওষুধ খাবেন না। যা খাবেন উত্তমরূপে চিবিয়ে খাবেন। সেই খাদ্য খাবেন যা মনে চায়। খেয়ে পানি পান করবেন না। আর পানি পান করে খাবেন না, প্রস্রাব পায়খানা আটকে রাখবেন না। দিনের খাদ্য খেয়ে নিদ্রা যাবেন এবং রাতের খাদ্য খেয়ে নিদ্রার পূর্বে পায়চারি করবেন, তা একশত কদম হলেও। জনৈক হাকীম তার পুত্রকে বলল ঃ সকালে কিছু খাওয়া ছাড়া বের হয়ো না। খাদ্যে সংযম সুস্থ ব্যক্তির জন্যে ক্ষতিকর, যেমন অসংযম রোগীর জন্যে ক্ষতিকর।

যে বাড়ীতে কেউ মারা যায়, সে বাড়ীতে খাদ্য পাঠানো মোস্তাহাব। সেমতে জাফর ইবনে আবী তালেবের মৃত্যু সংবাদ এলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ জাফরের গৃহের লোকজন মৃতকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে খাদ্য তৈরী করতে পারবে না। তাদের কাছে কিছু খাদ্য পাঠিয়ে দাও। কাজেই এটা সুন্নত।

জালেমের খাদ্য খাবে না। জোরজবরদস্তি করলে সামান্য খাবে। কথিত আছে, যুন্নুন মিসরী গ্রেফতার হয়ে কিছু দিন কয়েদখানায় অতিবাহিত করেন। তাঁর এক ধর্ম ভগ্নী সুতা কেটে কয়েদখানার দারোগার হাতে খানা প্রেরণ করলে তিনি তা খেলেন না। মুক্তি পাওয়ার পর সেই ভগ্নী এসে অভিযোগ করলে তিনি বললেন ঃ খাদ্য হালাল ছিল; কিন্তু জালেমের পাত্রে এবং তার হাতে এসে ছিল। তাই আমি খাইনি। অর্থাৎ, দারোগার মারফতে না এলে খেতাম। বলাবাহুল্য, এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের তাকওয়া।

ফাতাহ্ মুসেলী (রঃ) একবার বিশরে হাফীর সাথে দেখা করতে গেলেন। বিশর দেরহাম বের করে খাদেম আহমদকে বললেন ঃ উৎকৃষ্ট খাদ্য ও ভাল ব্যঞ্জন কিনে আন। আহমদ বলেন ঃ আমি খুব পরিচ্ছন্ন রুটি, কিছু দুধ ও উৎকৃষ্ট খেজুর কিনে আনলাম এবং সবগুলো ফাতাহ্ মুসেলীর সামনে রেখে দিলাম। তিনি খেয়ে অবশিষ্ট খাদ্য সাথে নিয়ে গেলেন। অতঃপর বিশরে হাফী আমাকে বললেন ঃ আহমদ, আমি উৎকৃষ্ট খাদ্য আনতে বলেছিলাম কেন, জান? এর কারণ ছিল, উৎকৃষ্ট খাদ্য আন্তরিক শোকর ওয়াজিব করে। ফাতাহ আমাকে খেতে বলেননি। এর কারণ, মেযবানকে খেতে বলা মেহমানের জন্যে জরুরী নয়। অবশিষ্ট খাদ্য সাথে নিয়ে গেলেন কেন জান? এর কারণ, তাওয়াক্কুল বিশুদ্ধ হলে পাথেয় নেয়া ক্ষতিকর হয় না। তিনি যেন এসব মাসআলা তোমাকে শিক্ষা দিয়ে গেলেন। আবু আলী রুদবারী এক ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেন, তিনি দাওয়াত করে এক হাজার বাতি জ্বালালেন। এক ব্যক্তি আপত্তি করে বলল ঃ আপনি অপব্যয় করেছেন। তিনি বললেন ঃ তুমি ভিতরে গিয়ে সে বাতিটি নিভিয়ে দাও যেটি আমি আল্লাহর ওয়াস্তে জ্বালিনি। সে ভিতরে গিয়ে শত চেষ্টা করল, কিন্তু একটি বাতিও নিভাতে পারল না। অবশেষে সে হার মানতে বাধ্য হল।

ইমাম শাফেয়ীর উক্তি অনুযায়ী খাওয়া চার প্রকার। এক, এক আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া। এটা আল্লাহ তাআলার ক্রোধের কারণ। দুই, দু'আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া। এটা অহংকার। তিন, তিন আঙ্গুলে খাওয়া। এটা সুন্নত তরীকা। চার, পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া। এটা তীব্র লোভের পরিচায়ক।

চারটি বস্তু দেহকে দুর্বল করে– অধিক সহবাস, অধিক দুঃখ, প্রায়ই খালি পেটে পানি পান করা এবং বেশী পরিমাণে টক খাওয়া।

তিনটি বস্তু দৃষ্টি শক্তি প্রখর করে– কেবলামুখী হয়ে বসা, নিদ্রার সময় সুরমা লাগানো এবং সবুজ বনানী দেখা।

পয়গম্বরগণ চিৎ হয়ে শয়ন করেন। কেননা তাঁরা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন। আলেম ও আবেদগণ ডান পার্শ্বে শয়ন করেন। রাজা-বাদশাহ্রা খাদ্য হজম হওয়ার জন্যে বাম পার্শ্বে শয়ন করেন। উপুড় হয়ে শয়ন করা শয়তানের কাজ।
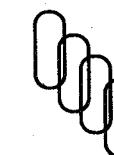
একাদশ অধ্যায়

বিবাহ

প্রকাশ থাকে যে, বিবাহ ধর্ম কাজে সহায়ক, শয়তানের চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার সুদৃঢ় প্রাচীর এবং উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান উপায়। এই সংখ্যাবৃদ্ধির মাধ্যমে নবী করীম (সাঃ) অন্যান্য পয়গম্বরের মোকাবিলায় গর্ব করবেন। এ দিক দিয়ে বিবাহের কারণাদি অনুসন্ধান, সুন্নতসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং আদব সম্পর্কে আলোচনা খুবই সমীচীন। আমরা এর উদ্দেশ্য, প্রকার ও প্রয়োজনীয় বিধানাবলী তিনটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবাহের ফযীলত ও বিবাহের প্রতি বিমুখতা

বিবাহের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ এর ফযীলত এমনি বর্ণনা করেন যে, বিবাহ করা আল্লাহর এবাদতের জন্যে নির্জনবাস অপেক্ষা উত্তম। কেউ ফযীলত স্বীকার করেন; কিন্তু নারী সহবাসের উদ্দীপনা না থাকলে এবাদতের জন্যে নির্জনবাসকে উত্তম বলেন। কেউ কেউ বলেন ঃ আমাদের এ যুগে বিবাহ না করাই শ্রেয়ঃ। আগেকার যুগে এর ফযীলত ছিল। তখন মহিলাদের বদভ্যাস ছিল না। এখন বাস্তব সত্য কি, তা পক্ষ ও বিপক্ষের হাদীস বর্ণনা এবং বিবাহের উপকারিতা ও অপকারিতা ব্যাখ্যা করার পরই জানা যাবে। তাই আমরা এ পরিচ্ছেদটি চার ভাগে বিভক্ত করছি।

বিবাহের ফযীলত ঃ এ সম্পর্কিত আয়াতগুলো এই ঃ وَانْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ (তোমাদের বিধবাদেরকে বিবাহ দাও।) এখানে صيغة الامر ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে বিবাহ ওয়াজিব বুঝা যায়। وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ (স্বামীদেরকে বিয়ে করে নিতে তাদেরকে বাধা দিয়ো না।) এখানে বিয়েতে বাধাদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পয়গম্বরগণের প্রশংসা ও গুণকীর্তনে এরশাদ হয়েছে ঃ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً (আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ

করেছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দিয়েছি।) একথা অনুগ্রহ ও কৃপা প্রকাশের স্থলে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ওলীগণের প্রশংসাও করছেন, তারা তাঁর কাছে সন্তান সন্ততির জন্যে আবেদন করেন। সেমতে বলা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ـ

অর্থাৎ, যারা বলে, পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির তরফ থেকে চক্ষুর শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে পরহেযগারদের অগ্রদূত করুন।

বলা হয়, আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাবে সেই পয়গম্বরগণেরই উল্লেখ করেছেন, যারা সপত্নীক ছিলেন। হাঁ, দুজন পয়গম্বর হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা (আঃ) এর ব্যতিক্রম। তাঁদের মধ্যে ইয়াহইয়া (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি বিবাহ করেছিলেন; কিন্তু সহবাস করেননি। কেবল বিবাহের ফযীলত অর্জন ও বিবাহের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বিবাহ করেছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ) যখন পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন, তখন বিবাহ করবেন এবং সন্তানাদিও হবে।

বিবাহের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসগুলো এই ঃ

النكاح سنتى فمن رغب عن سنتى فقد رغب عنى

অর্থাৎ, বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নতের প্রতি বিমুখ হয়, সে আমার প্রতি বিমুখ হয়।

النكاح سنتى فمن احب فطرتى فليستن بسنتى

অর্থাৎ, বিবাহ আমার সুন্নত। যে আমার ধর্মকে মহব্বত করে, সে যেন আমার সুন্নত পালন করে।

تناكحوا تكثروا فانى اباهى بكم الامم يوم القيامة حتى بالسقط ـ

বিবাহ কর এবং অনেক সংখ্যক হয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে নিয়ে কেয়ামতের দিন অন্য সকল উম্মতের উপর গর্ব করব। এমনকি

গর্ভপাতজনিত শিশুদের নিয়েও।

ومن رغب عن سنتي فليس مني وان من سنتي النكاح فمن احبني فليستن بسنتي .

অর্থাৎ, যে আমার সুন্নতের প্রতি বিমুখ হয়, সে আমার দলভুক্ত নয়। বিবাহ আমার অন্যতম সুন্নত। অতএব, যে আমাকে মহব্বত করে, সে যেন আমার সুন্নত পালন করে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে দারিদ্র্যের ভয়ে বিবাহ বর্জন করে, সে আমার দলভুক্ত নয়। এ হাদীসে যে কারণে বিবাহ থেকে বিরত থাকা হয়, সেই কারণের নিন্দা করা হয়েছে– বিবাহ বর্জনের নিন্দা করা হয়নি। আরও বলা হয়েছে, যে সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। এক হাদীসে আছে–

من استطاع منكم بالباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لا فليصم فان الصوم له وجاع .

অর্থাৎ, যার যৌন সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে। কারণ, এতে দৃষ্টি বেশী নত থাকে এবং লজ্জাস্থানের অধিক হেফাযত হয়। আর যে বিবাহ করতে না পারে সে যেন রোযা রাখে। কারণ, রোযা তার জন্যে খাসী হওয়ার শামিল।

এ থেকে জানা গেল, বিবাহের ফযীলতের কারণ হচ্ছে চক্ষু ও লজ্জাস্থান দূষিত হওয়ার আশংকা। খাসী হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে রোযার কারণে কামভাব হ্রাস পাওয়া। এক হাদীসে আছে– যখন তোমার কাছে এমন কেউ আসে যার ধর্মপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততায় তুমি সন্তুষ্ট, তখন তার বিবাহ করে দাও। এরূপ না করলে পৃথিবীতে গোলযোগ ও অনর্থ সৃষ্টি হবে। এখানে ফযীলতের কারণ গোলযোগের আশংকা বর্ণিত হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে নিজে বিবাহ করবে অথবা অন্যের বিবাহ করে দেবে, সে আল্লাহ তাআলার ওলী হওয়ার হকদার হয়ে যাবে। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে– যে ব্যক্তি বিবাহ করে, সে তার অর্ধেক ধর্ম সংরক্ষিত করে নেয়। এখন বাকী অর্ধেকের জন্যে তার উচিত আল্লাহকে ভয় করা। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, বিবাহের ফযীলতের

কারণ হচ্ছে বিরোধ থেকে বাঁচা এবং অনর্থ থেকে দূরে থাকা। কেননা, দুটি বস্তুই মানুষের ধর্ম বিনষ্ট করে– লজ্জাস্থান ও পেট। বিবাহ করলে লজ্জাস্থানের বিপদ থেকে বাঁচা যায়। আরও বলা হয়েছে– মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি বিষয় বাকী থাকে। একটি হচ্ছে সৎ সন্তান। যে মৃত পিতার জন্যে দোয়া করে। বলাবাহুল্য, সন্তান হওয়ার উপায় বিবাহ ছাড়া কিছুই নয়।

বিবাহের ফযীলত সম্পর্কিত সাহাবায়ে কেরামের উক্তিসমূহ ঃ হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন ঃ ধর্মপরায়ণতা বিবাহে বাধা সৃষ্টি করে না। কেবল দুটি বিষয়ই বিবাহে বাধা দান করে– অক্ষমতা ও দুশ্চরিত্রতা। এতে তিনি বিবাহের বাধা দুটি বিষয়ে সীমিত করে দিয়েছেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ বিবাহ না করা পর্যন্ত আবেদের এবাদত পূর্ণ হয় না। এঁর উদ্দেশ্য বিবাহ এবাদতের পরিশিষ্ট, কিন্তু বাহ্যতঃ তার উদ্দেশ্য এই মনে হয় যে, কামভাব প্রবল হওয়ার কারণে অন্তরের নিরাপত্তা বিবাহ ব্যতীত কল্পনীয় নয়। অন্তরের নিরাপত্তা ছাড়া এবাদত হতে পারে না। এ কারণেই তাঁর কয়েকজন গোলাম যখন বালেগ হয়ে যায়, তখন তাদেরকে একত্রিত করে তিনি বললেন ঃ তোমরা বিবাহ করতে চাইলে আমি বিবাহ করিয়ে দেব। কারণ, মানুষ যখন যিনা করে, তখন তার অন্তর থেকে ঈমান বের করে নেয়া হয়। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলতেন ঃ ধরে নেয়া যাক, আমার বয়সের মাত্র দশ দিন বাকী আছে, তবু বিবাহ করে নেয়াই আমার কাছে ভাল মনে হয়, যাতে আল্লাহ্ তাআলার সামনে অবিবাহিত গণ্য হয়ে না যাই। হযরত মুয়ায ইবনে জ্বাবালের দুই স্ত্রী মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং নিজেও মহামারীতে আক্রান্ত ছিলেন, কিন্তু এই অবস্থায়ও বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছিলেন ঃ আল্লাহর সাথে অবিবাহিত হয়ে সাক্ষাৎ করতে আমার লজ্জা বোধ হয়। এ দুটি উক্তি থেকে বুঝা যায়, এ দুজন সাহাবীর মতে কামভাবের প্রাবল্য থেকে আত্মরক্ষা ছাড়া বিবাহের অন্যান্য ফযীলতও ছিল। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) একাধিক বিবাহ করেছেন এবং বলতেন ঃ আমি কেবল সন্তানের জন্যে বিবাহ করি। জনৈক সাহাবী কেবল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতই করতেন এবং রাতে তাঁর কাছেই থাকতেন। তিনি একদিন উক্ত সাহাবীকে বললেন ঃ তুমি বিয়ে কর না কেন? সাহাবী আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, একে তো আমি নিঃস্ব, কোন বিষয় আশয় নেই, দ্বিতীয়তঃ

আপনার খেদমত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) চুপ হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর আবার একথা বললে সাহাবী একই জওয়াব দিলেন, কিন্তু এবার সাহাবী মনে মনে চিন্তা করলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার মঙ্গল আমার চেয়ে বেশী বুঝেন। আমার জন্যে যা অধিক সমীচীন এবং আল্লাহর নৈকট্যের কারণ, তা তিনি জানেন। যদি তৃতীয় বার বলেন, তবে বিয়ে করে নেব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তৃতীয় বার বললে সাহাবী আরজ করলেন ঃ আপনি আমার বিয়ে করিয়ে দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ অমুক গোত্রে গিয়ে বল, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদেরকে আদেশ করেছেন তোমাদের মেয়ে আমার সাথে বিয়ে দিতে। সাহাবী আরজ করলেন ঃ হুযুর, আমার কাছে কিছু নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে বললেন ঃ তোমরা খেজুরের বীচি পরিমাণ স্বর্ণ সংগ্রহ করে তোমাদের এ ভাইকে দাও। সাহাবায়ে কেরাম তাই করলেন এবং এই সাহাবীকে সেই গোত্রে নিয়ে বিবাহ করিয়ে দিলেন। এর পর লোকের ওলীমা খাওয়ার বাসনা প্রকাশ করলে সাহাবীদের সকলে মিলে একটি ছাগলের ব্যবস্থা করে দেন। এ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বার বার বিয়ে করতে বলা এ কথাই জ্ঞাপন করে যে, খোদ বিবাহের মধ্যে ফযীলত রয়েছে। এটাও সম্ভব যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর বিবাহের প্রয়োজন জানতে পেরেছিলেন।

কথিত আছে, পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে জনৈক আবেদ এবাদতে সমসাময়িক সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সে সময়ের পয়গম্বরের সামনে তার আলোচনা হলে পয়গম্বর বললেন ঃ যদি একটি সুন্নত বর্জন না করত, তবে সে চমৎকার ছিল বটে। আবেদ পয়গম্বরের কথা শুনে দুঃখিত হয়ে তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে বলল ঃ আমি কোন্ সুন্নতটি বর্জন করেছি? পয়গম্বর বললেন ঃ তুমি বিবাহ বর্জন করেছ। আবেদ আরজ করল ঃ আমি বিবাহ নিজের উপর হারাম করিনি, কিন্তু আমি নিঃস্ব, আমার ব্যয়ভার অন্যে বহন করে। এ কারণে কেউ আমাকে কন্যা দান করে না। পয়গম্বর বললেন ঃ আমি তোমাকে আমার কন্যা দিচ্ছি। সেমতে আবেদের সাথে পয়গম্বর কন্যার বিয়ে হয়ে গেল। বিশর ইবনে হারেস (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তিনটি বিষয়ে আমার উপর ফযীলত রাখেন। প্রথম, তিনি নিজের জন্যে ও অন্যের জন্যে হালাল রুজি অন্বেষণ করেন, আর আমি কেবল নিজের জন্যেই অন্বেষণ করি। দ্বিতীয়, তিনি বিবাহ

করার অবকাশ রাখেন; কিন্তু আমি এ ব্যাপারে সংকীর্ণ। তৃতীয়, তিনি জনগণের ইমাম।

কথিত আছে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের পত্নী অর্থাৎ, আবদুল্লাহ জননী যেদিন ইন্তেকাল করেন, তার পরের দিন তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করে নেন এবং বলেন ঃ আমার মনে হয় যেন রাতে আমি অবিবাহিত। বিশরকে লোকে বলল, মানুষ আপনাকে বিবাহের সুন্নত বর্জনকারী বলে থাকে। বিশর বললেন ঃ আপত্তিকারীদেরকে বলে দাও, আমি ফরযের কারণে সুন্নত থেকে বিরত রয়েছি। পুনরায় কেউ তাঁর বিবাহের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করলে তিনি বললেন ঃ এ আয়াত আমাকে বিবাহ থেকে বিরত রেখেছে– وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ মহিলাদেরও নিয়মানুযায়ী হক আছে, যেমন তাদের উপর স্বামীদের হক আছে। বর্ণিত আছে, বিশরকে মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? তিনি বললেন ঃ জান্নাতে আমার মর্যাদা উঁচু হয়েছে এবং পয়গম্বরগণের মর্তবার কাছে পৌছেছে; কিন্তু বিবাহিতদের মর্তবা পর্যন্ত পৌছেনি। সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ অধিক পত্নী দুনিয়াদারী নয়। কেননা, হযরত আলী (রাঃ) অন্য সাহাবীগণের তুলনায় অধিক সংসারত্যাগী ছিলেন। অথচ তাঁর চার জন পত্নী ছিলেন।

বিবাহের প্রতি বিমুখ হওয়ার কারণ ঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেনঃ দুশ' বছর পরে মানুষের মধ্যে সেই উত্তম হবে, যে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কম রাখবে। তার না স্ত্রী থাকবে, না বাচ্চা। তিনি আরও বলেন, এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ তার স্ত্রী, পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততির হাতে ধ্বংস হবে। তারা দারিদ্র্যের খোঁটা দেবে এবং তাকে এমন কাজ করতে বলবে, যা তার আয়ত্তাধীন নয়। ফলে সে এমন পথে পদচারণা করবে, যেখানে তার ধর্ম বরবাদ হবে। কাজেই সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এক হাদীসে আছে– সন্তান-সন্ততি কম হওয়াও দুই ধনাঢ্যতার একটি। পক্ষান্তরে পরিবার-পরিজন বেশী হওয়াও দুই দারিদ্র্যের একটি। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ একা ব্যক্তি আমলের স্বাদ ও অন্তরের প্রশস্ততা যতটুকু পায়, সপত্নীক ব্যক্তি ততটুকু পায় না। একথাও তিনিই বলেন– আমি আমার সঙ্গীদের মধ্যে কাউকে পাইনি, যে

বিবাহ করার পর তার প্রথম মর্তবায় কায়েম রয়েছে। তিনি আরও বলেন ঃ তিনটি বিষয় যে অন্বেষণ করে সে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এক, যে জীবিকা অন্বেষণ করে, দুই, যে কোন মহিলাকে বিয়ে করে এবং তিন, যে হাদীস লেখে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যে বান্দার কল্যাণ করতে চান, তাকে অর্থকড়ি, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে মশগুল করেন না। একদল লোক এ উক্তি নিয়ে বিতর্ক করার পর সাব্যস্ত করে যে, এ অর্থকড়ি, স্ত্রী ও সম্পদ মোটেই থাকবে না; বরং উদ্দেশ্য এগুলো থাকবে ঠিকই; কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা হবে না। এ বিষয়টিই আবু সোলায়মান দারানীর এই উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়, অর্থকড়ি, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি যে বস্তুই তোমাকে আল্লাহর পথে বাধা দেয়, তাই তোমার জন্যে অলক্ষুণে। মোট কথা, যারা বিবাহ থেকে বিরত হওয়ার কথা বলেছেন, তারা সর্বাবস্থায় বলেননি; বরং একটি শর্তাধীনে বলেছেন। বিবাহের ফযীলতও সর্বাবস্থায় এবং শর্তাধীনে বর্ণিত আছে। তাই বিবাহের উপকারিতা ব্যাখ্যা করা আমাদের জন্যে জরুরী হয়ে পড়েছে।

বিবাহের উপকারিতা ঃ সন্তান হওয়া, কামপ্রবৃত্তি নিবারণ করা, ঘরকন্নার ব্যবস্থা করা, দল বৃদ্ধি করা, মহিলাদের সাথে থাকার ব্যাপারে আত্মিক সাধনা করা– সংক্ষেপে এই পাঁচটি বিষয় হচ্ছে বিবাহের উপকারিতা। এখন প্রত্যেকটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানা দরকার।

(১) সন্তান হওয়া ঃ সবগুলোর মধ্যে এটাই মূল। মানব বংশ অব্যাহত রাখার উদ্দেশেই বিবাহ প্রবর্তিত হয়েছে, যাতে জগৎ মানবশূন্য হয়ে না যায়। নর ও নারীর মধ্যে নিহিত কাম-বাসনা সন্তান হওয়ার একটি সূক্ষ্ম ব্যবস্থা। যেমন জন্তুকে জালে আবদ্ধ করার জন্যে দানা ছড়িয়ে দেয়া হয়, তেমনি নর নারীর সহবাসস্পৃহা সন্তান লাভের একটি উপায়। খোদায়ী শক্তি এসব ঝামেলা ছাড়াই মানব সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিল; কিন্তু খোদায়ী প্রজ্ঞা এটাই চেয়েছে যে, ঘটনাবলী কারণাদির মধ্যেই সীমিত থাকুক। যদিও এর প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু আপন কুদরত জাহির করা, বিস্ময়কর কারিগরি সম্পন্ন করা এবং স্বীয় পূর্ব ইচ্ছা, নির্দেশ ও কলমের লিখন অনুযায়ী অস্তিত্ব দান করার জন্যে এ ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়েছে। কামপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত অবস্থায় সন্তান লাভের উপায় হিসেবে বিবাহ করলে তা চারি প্রকারে সওয়াবের কারণ হয়, যা বিবাহের ফযীলতের মূল কথা। এমনকি এগুলোর কারণেই বুযুর্গগণ অবিবাহিত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার

সামনে যাওয়া পছন্দ করেননি। প্রথম, সন্তান লাভের চেষ্টা করা আল্লাহ তাআলার মর্জির অনুকূল। কেননা, এতে মানব জাতির অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকে। দ্বিতীয় ঃ এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি মহব্বত পাওয়া যায়। কেননা, যে সংখ্যাধিক্য নিয়ে তিনি গর্ব করতেন, এ চেষ্টা তারই অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়, মৃত্যুর পর সৎকর্মপরায়ণ সন্তানের দোয়া আশা করা যায়। চতুর্থ, কচি বয়সে সন্তান মারা গেলে সে সুপারিশকারী হবে বলে আশা করা যায়। এই প্রকার চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম প্রকারটি সর্বাধিক সূক্ষ্ম এবং জনসাধারণের বোধগম্যতার ঊর্ধ্বে। অথচ আল্লাহ তাআলার অভূতপূর্ব কারিগরি ও বিধানাবলী সম্পর্কে যারা সম্যক জ্ঞাত, তাদের মতে এটাই সর্বাধিক শক্তিশালী ও সঠিক প্রকার। এর প্রমাণ, যদি কোন মনিব তার গোলামকে বীজ, কৃষিক্ষেত্র সরবরাহ করে এবং গোলামও সে কাজ করতে সক্ষম হয়, তবে গোলাম অলসতা করে কৃষিকাজের সাজসরঞ্জাম বেকার ফেলে রাখলে এবং বীজ নষ্ট করে দিলে অবশ্যই মনিবের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির পাত্র হবে। এখন দেখা দরকার, আল্লাহ তাআলা মানুষকে কি সরবরাহ করেছেন? তিনি মানুষকে যুগল সৃষ্টি করেছেন, নরকে প্রজননযন্ত্র ও অণ্ডকোষ দিয়েছেন এবং কটিদেশে বীর্য সৃষ্টি করে তা শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অপর দিকে নারীর গর্ভাশয়কে বীর্য ধারণের পাত্র করেছেন। এর পর নর নারী উভয়ের উপর কামপ্রবৃত্তি ও যৌনবাসনা চাপিয়ে দিয়েছেন। এসব আয়োজন স্পষ্ট ভাষায় স্রষ্টার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। যদি আল্লাহ তাআলা রসূলের (সাঃ) মুখে আপন উদ্দেশ্য বর্ণনা নাও করতেন, তবুও বুদ্ধিমানদের জন্যে এসব আয়োজন ও সাজসরঞ্জামের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝে নেয়া কঠিন ছিল না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বীয় রসূল (সাঃ)-এর মুখে এ উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি এরশাদ করেন ঃ تناكحوا تناسلوا তোমরা পরস্পরে বিবাহ কর এবং বংশ বিস্তার কর। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি বিবাহ থেকে বিরত থাকবে সে কৃষিকাজে বিমুখ, বীজ ধ্বংসকারী এবং আল্লাহ তাআলার আয়োজন ব্যর্থকারী হিসেবে গণ্য হবে। সে প্রকৃতির সেই উদ্দেশ্য ও রহস্যের খেলাফ করবে, যা সৃষ্টি অবলোকন করে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

এ কারণেই শরীয়ত সন্তান হত্যা করতে এবং জীবিত কবরস্থ করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছে। কেননা, এটাও অস্তিত্ব পূর্ণ হওয়ার পরিপন্থী। সার কথা, যে বিবাহ করে, সে এমন একটি বিষয় পূর্ণ করতে

সচেষ্ট হয়, যা পূর্ণ করা আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যে বিবাহ থেকে বিরত থাকে, সে এমন বস্তুকে বিনষ্ট ও বেকার করে দেয়, যা বিনষ্ট করা আল্লাহ তাআলার কাছে অপছন্দনীয়। এছাড়া সে সেই বংশের গতি স্তব্ধ করে দেয়, যা আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে তার অস্তিত্ব পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছিলেন এবং সে নিজেই কৌশল করে, যাতে তার মৃত্যুর পর সন্তান-সন্ততি তার স্থলাভিষিক্ত না হয়। যদি বিবাহের কারণ যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই হত, তবে হযরত মুয়ায মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে বলতেন না যে, আমাকে বিবাহ করাও, যাতে আল্লাহ তাআলার কাছে অবিবাহিত অবস্থায় না যাই। এখানে প্রশ্ন হয়, তখন তাঁর সন্তানের আশা ছিল না, তবুও বিবাহের বাসনা করার কারণ কি ছিল? এর জওয়াব, সন্তান সহবাসের ফলে হয়। সহবাসের কারণ যৌনস্পৃহা। এটা বান্দার ইচ্ছাধীন নয়। যৌনস্পৃহায় গতিবেগ সঞ্চার করে, কেবল এমন বিষয় মওজুদ করাই বান্দার ইচ্ছাধীন। এটা সর্বাবস্থায় হতে পারে। সুতরাং যে বিবাহ করে সে তার দায়িত্ব পূর্ণ করে। অবশিষ্ট বিষয়গুলো তার আয়ত্তের বাইরে। এ কারণেই পুরুষত্বহীন ব্যক্তির জন্যেও বিবাহ করা মোস্তাহাব। বিবাহ সন্তান লাভের উপায়, এর দ্বিতীয় কারণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহব্বত ও সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। যে বস্তু দ্বারা তিনি গর্ব করবেন, তার প্রাচুর্য বিবাহ দ্বারাই হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর কার্য থেকেও তা বুঝা যায়। বর্ণিত আছে, তিনি একাধিক বিবাহ করেছেন। তিনি বলতেন ঃ আমি সন্তানের জন্যে বিবাহ করি। হাদীসে বর্ণিত বন্ধ্যা নারীর নিন্দা থেকেও একথা বুঝা যায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ গৃহের কোণের মাদুর বন্ধ্যা নারীর তুলনায় উত্তম। তিনি আরও বলেন ঃ خير نسائكم الولود الودود –যে নারী সন্তান প্রসব করে এবং ভালবাসে, সে তোমাদের উত্তম স্ত্রী। আরও বলা হয়েছে– কৃষ্ণাঙ্গ সন্তান প্রসবকারিণী নারী সুন্দরী বন্ধ্যা নারী অপেক্ষা উত্তম। এসব রেওয়ায়েত থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, বিবাহের ফযীলতে সন্তান চাওয়ারও দখল আছে। কেননা, সুন্দরী স্ত্রী পুরুষের পবিত্রতা কায়েম রাখা, দৃষ্টি নত রাখা এবং কাম-বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে অধিক শোভনীয়। এতদসত্ত্বেও সন্তানের দিকে লক্ষ্য করে কৃষ্ণাঙ্গী মহিলাকে তার উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় কারণ– মৃত্যুর পর সৎ সন্তান থাক, যে পিতার জন্যে দোয়া করবে। হাদীসে আছে, সন্তানের দোয়া পিতার সামনে নূরের খাঞ্চায় রেখে পেশ করা হয়। কোন কোন লোক বলে, মাঝে মাঝে সন্তান সৎ হয় না। এটা বাজে কথা। কেননা, ধর্মপরায়ণ মুসলমানের সন্তান প্রায়শঃ সৎ-ই হবে; বিশেষতঃ যখন তাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করা হয় এবং ভাল কাজে নিয়োজিত রাখা হয়। সারকথা, সৎ হোক কিংবা অসৎ, সর্বাবস্থায় ঈমানদারের দোয়া পিতা-মাতার জন্যে উপকারী হয়ে থাকে। সন্তান সৎকাজ করে দোয়া করলে পিতা তার সওয়াব পাবে। কেননা, সন্তান তার উপার্জন, কিন্তু অসৎ কাজ করলে পিতাকে তজ্জন্যে জওয়াবদিহি করতে হবে না। কেননা, কোরআনে বলা হয়েছে ঃ لَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

একজনের পাপের বোঝা অন্য জনে বহন করবে না।

উপরোক্ত বিষয়টিই আল্লাহ তা'আলা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

اَلْحَقْنَابِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ

অর্থাৎ, আমি মিলিয়ে দেব তাদের সাথে তাদের সন্তানদেরকে এবং তাদের কোন আমল হ্রাস করব না। অর্থাৎ, তাদের আমল হ্রাস না করে অতিরিক্ত অনুগ্রহস্বরূপ তাদের সন্তানকে তাদের সাথে সংযুক্ত করে দেব।

চতুর্থ কারণ– অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান পূর্বে মারা গেলে পিতামাতার জন্যে সুপারিশকারী হবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ সন্তান তার পিতামাতাকে জান্নাতের দিকে টেনে নেবে। কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে– সন্তান পিতামাতার কাপড় ধরবে, যেমন আমি তোমার কাপড় ধরছি। আরও বলা হয়েছে– সন্তানকে জান্নাতে প্রবেশ করতে বলা হবে। সে জান্নাতের দরজায় পৌঁছে থেমে যাবে এবং রাগ করে বলবে ঃ আমার পিতামাতা সঙ্গে থাকলে আমি জান্নাতে যাব। তখন আদেশ হবে– তার পিতামাতাকে তার সাথে জান্নাতে দাখিল কর। অন্য হাদীসে আছে, কেয়ামতের ময়দানে হিসাব-নিকাশের জন্যে সন্তানরা সমবেত হলে ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবে ঃ তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাও। সন্তানরা জান্নাতের দরজায় আসবে। তাদেরকে বলা হবে– মুসলমানের সন্তানরা, তোমরা ভিতরে এস। তোমাদের কোন হিসাব-কিতাব নেই। সন্তানরা বলবে ঃ আমাদের পিতামাতা কোথায়? ফেরেশতারা বলবে ঃ তারা তোমাদের মত নয়। তাদের পাপকর্ম আছে। তাদের হিসাব-নিকাশ

আছে। একথা শুনে সন্তানরা হঠাৎ গোঁ ধরবে এবং জান্নাতের দরজায় ফরিয়াদ করতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করবেন ঃ এই ফরিয়াদ কিসের? ফেরেশতারা বলবে ঃ ইলাহী, এরা মুসলমানদের সন্তান। এরা বলে ঃ আমরা পিতামাতাকে সঙ্গে না নিয়ে জান্নাতে যাব না। আল্লাহ তা'আলা আদেশ করবেন– এই দলের মধ্যে যাও এবং তাদের পিতামাতার হাত ধরে জান্নাতে দাখিল কর। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

من مات له اثنان من الولد فقد احتظر محتظرا من النار -

অর্থাৎ, যার দু'সন্তান মারা যায়, তার মধ্যে ও জাহান্নামের অগ্নির মধ্যে একটি প্রাচীর অন্তরায় হয়ে যাবে। আরও আছে–

من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم قيل يا رسول الله واثنان قال واثنان -

অর্থাৎ, যার তিনটি সন্তান বালেগ হওয়াব পূর্বে মারা যায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন সন্তানদের প্রতি অতিরিক্ত রহমতস্বরূপ। কেউ প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! দু'জন মারা গেলে? তিনি বললেন ঃ দু'জন মারা গেলেও তাই হবে।

জনৈক বুযুর্গকে লোকেরা বিবাহ করতে বলত, কিন্তু তিনি কিছুদিন পর্যন্ত অস্বীকার করতে থাকেন। একদিন ঘুম থেকে উঠে বলতে লাগলেনঃ আমাকে বিবাহ করিয়ে দাও। লোকেরা তাঁকে বিয়ে করিয়ে দিল এবং বিয়ে করার খাহেশ হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করল। বুযুর্গ বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হয়তো আমাকে ছেলে দেবেন এবং শৈশবে তার মৃত্যু হবে। ফলে পরকালে সে আমার উপকারে আসবে। এর পর বললেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন কেয়ামত কায়েম হয়েছে। সকলের সাথে আমিও কেয়ামতের ময়দানে দন্ডায়মান। পিপাসায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। অন্য সবই পিপাসায় তেমনি কাতর। এর পর দেখি, কিছু সংখ্যক শিশু কাতার ডিঙ্গিয়ে চলে আসছে। তাদের মাথায় নূরের রুমাল এবং হাতে রূপার পাত্র ও স্বর্ণের গ্লাস। তারা এক একজনকে পানি পান করিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ছে এবং অনেককে ছেড়েও চলেছে। আমি এক শিশুর দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম ঃ পিপাসায় আমার শোচনীয় অবস্থা। আমাকে পানি পান

করাও। সে বলল ঃ আমরা মুসলমানদের সন্তান– শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলাম।

কোরআনে বলা হয়েছে وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ তোমরা নিজেদের জন্যে অগ্রে প্রেরণ কর।

এর এক অর্থ এরূপও করা হয়েছে, এখানে উদ্দেশ্য শিশুদেরকে অগ্রে প্রেরণ করা। মোট কথা, উপরোক্ত চারটি কারণ থেকেই জানা গেল, বিবাহের ফযীলত বেশীর ভাগ এ কারণেই যে, এটা সন্তান লাভ করার উপায়।

বিবাহের দ্বিতীয় উপকারিতা হচ্ছে, শয়তানের চক্রান্ত থেকে হেফাযতে থাকা, কামস্পৃহা দমিত রাখা এবং দৃষ্টি নত রাখা। এতে করে লজ্জাস্থান সংরক্ষিত হয়ে যায়। হাদীসে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছে– যে বিবাহ করে সে তার অর্ধেক ধর্ম বাঁচিয়ে নেয়। অতঃপর বাকী অর্ধেকের জন্যে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। এ উপকারিতা প্রথম উপকারিতার তুলনায় কম। কেননা, কামস্পৃহার বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বিবাহ যথেষ্ট; কিন্তু যে ব্যক্তি সন্তান লাভ তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে বিবাহ করে, সে মর্তবায় সেই ব্যক্তির উপরে, যে কেবল কামস্পৃহার বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বিবাহ করে। তবে কামস্পৃহা সন্তান লাভে সহায়ক হয়ে থাকে। এতে আর একটি রহস্য বিদ্যমান যে, কামস্পৃহা চরিতার্থ করার মধ্যে এমন আনন্দ রয়েছে, যা চিরস্থায়ী হলে তার সমতুল্য কোন আনন্দ নেই। এ আনন্দ জান্নাতে প্রতিশ্রুত আনন্দের সন্ধান দেয়। এটা উদ্রেক করার কারণ, যে আনন্দের স্বাদ জানা থাকে না, তার প্রতি উৎসাহিত করা অনর্থক হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ পুরুষত্বহীন ব্যক্তিকে নারী সম্ভোগের উৎসাহ দেয়া মোটেই উপকারী নয়। সুতরাং স্বাদ জানার জন্যেই মানুষের মধ্যে কামস্পৃহা সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে সে জান্নাতে একে চিরস্থায়ী করতে আগ্রহী হয়, যা আল্লাহ্ তাআলার এবাদতের উপর নির্ভরশীল। এখন আল্লাহ্ তাআলার প্রজ্ঞা ও রহমত চিন্তা করা দরকার যে, এক কামস্পৃহার মধ্যে তিনি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দু'প্রকার জীবন নিহিত রেখেছেন। বাহ্যিক জীবন এভাবে যে, কামস্পৃহার মাধ্যমে মানুষের বংশ বিস্তার অব্যাহত থাকে। এটাও মানব জাতির জন্যে এক প্রকার স্থায়িত্ব। আর আভ্যন্তরীণ জীবন

হচ্ছে পারলৌকিক জীবন, যার কারণ কামস্পৃহাই হয়ে থাকে। অর্থাৎ, কামস্পৃহার দ্রুত অবসান দেখে মানুষ চিরস্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ আনন্দ লাভের ফিকির করে এবং সেটা অর্জন করার জন্যে এবাদতে উদ্বুদ্ধ হয়। অতএব কামস্পৃহার কারণেই যেন জান্নাতের নেয়ামত হাসিলের সাধনা করা সহজ হয়ে যায়। সারকথা, কামোদ্দীপনা দমন হেতু বিবাহ করা শরীয়তে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেই ব্যক্তির জন্যে, যে অক্ষম ও পুরুষত্বহীন নয়। অধিকাংশ মানুষই এরূপ। এটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ, কামস্পৃহা প্রবল হলে এবং তা দমন করার মত তাকওয়ার শক্তি না থাকলে মানুষ কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে–

اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ -

অর্থাৎ, এমনটি না করলে পৃথিবীতে অনর্থ ও মহাগোলযোগ হবে।

কামস্পৃহা প্রবল হওয়ার সময় তাকওয়ার বাধা থাকলেও এর পরিণতি হবে, মানুষ কেবল বাহ্যিক অঙ্গকে বিরত রাখবে অর্থাৎ, দৃষ্টি নত ও লজ্জাস্থান সংরক্ষিত রাখবে; কিন্তু অন্তরকে কুমন্ত্রণা ও কুচিন্তা থেকে বাঁচানো তার ক্ষমতার বাইরে থাকবে। তার মনে এ ব্যাপারে দ্বন্দ্ব থাকবে এবং সহবাসের চিন্তাভাবনা হবে। মাঝে মাঝে এটা নামাযের ভেতরে উপস্থিত হতে পারে এবং নামাযের মধ্যে এমন কল্পনা আসতে পারে যা মানুষের কাছে বলা লজ্জার কারণে সম্ভবপর নয়। আল্লাহ তাআলা মনের অবস্থা জানেন। মনই মুরীদের জন্যে আখেরাতের পথে চলার একমাত্র পুঁজি। কাজেই মনে কুচিন্তা থাকা খুবই খারাপ। সদা-সর্বদা রোযা রাখলেও কুমন্ত্রণার মূল উৎপাটিত হয় না। হাঁ, রোযা রাখতে রাখতে দেহ দুর্বল এবং মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেলে কুমন্ত্রণা দূর হওয়া সম্ভবপর। এসব কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আবেদের এবাদত বিবাহ দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করে। কামস্পৃহার প্রাধান্য একটি ব্যাপক মসিবত। কম মানুষই এ থেকে মুক্ত থাকে। لَاتُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا আমাদেরকে এমন বোঝা বহন করতে দিয়ো না, যার শক্তি আমাদের নেই। –এ আয়াতের তফসীরে হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন ঃ এখানে কামোদ্দীপনা বুঝানো হয়েছে ঃ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا –মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে –এ আয়াতের তফসীরে হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ এখানে দুর্বল অর্থ যে নারী সম্ভোগের ব্যাপারে সবর করে না। হযরত কাইয়াস

বলেন ঃ যখন মানুষের পুরুষাঙ্গ উত্তেজিত হয়, তখন তার দুই তৃতীয়াংশ বুদ্ধি লোপ পায়। কেউ বলেন ঃ তার তৃতীয়াংশ দ্বীনদারী বরবাদ হয়ে যায়। নাওয়াদেরুত্তাফসীরে বর্ণিত আছে, مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি যখন তা ঘনীভূত হয় –এ আয়াতের তফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে উদ্দেশ্য পুরুষাঙ্গ উত্তেজিত হওয়া। মোট কথা, এটা এমন এক বিপদ, যা উত্তেজিত হলে তার মোকাবিলা জ্ঞানবুদ্ধি এবং দ্বীনদারীও করতে পারে না। এদিকেই ইশারা করা হয়েছে এই হাদীসে–

ما رايت من ناقصات عقل ودين اغلب لذى الباب منكن -

অর্থাৎ, নারীদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে– আমি এমন কোন স্বল্প বুদ্ধি ও স্বল্প দ্বীনওয়ালা দেখিনি, যে বুদ্ধিমানদের উপর তোমাদের চেয়ে অধিক প্রবল হয়ে যায়।

রসূলে করীম (সাঃ) দোয়ায় বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَقَلْبِىْ وَشَرِّ مَنِيِّىْ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আমার কানের, আমার চোখের, আমার অন্তরের এবং আমার বীর্যের অনিষ্ট থেকে। এখন বুঝা উচিত, যে বিষয় থেকে রসূলে পাক (সাঃ) আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, অন্য ব্যক্তি সে বিষয়ে অবহেলা কিরূপে করতে পারে?

বিবাহের তৃতীয় উপকারিতা হচ্ছে চিত্তবিনোদন এবং এর দ্বারা এবাদতে শক্তি সঞ্চয়। কেননা, মন এবাদত থেকে সব সময় পলায়নপর থাকে। এটা তার মজ্জাবিরোধী। সুতরাং মনকে সদাসর্বদা তার খেলাফ কাজে লাগিয়ে রাখলে সে অবাধ্য হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মাঝে মাঝে বিনোদনের মাধ্যমে তাকে সুখ দিলে সে খুশী থাকবে। নারীর সাথে চিত্তবিনোদনে এমন সুখ পাওয়া যায়, যা সকল ক্লেশ দূর করে দেয়। সুতরাং বৈধ বিষয় দ্বারা মনকে সুখ দেয়া জরুরী। কেননা, আল্লাহ বলেনঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا -

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে, যাতে সে তার কাছে অবস্থান করে।

হযরত আলী মুর্তযা (রাঃ) বলেন ঃ এক মুহূর্ত হলেও মনকে সুখ দাও। কেননা, যখন মনকে দিয়ে বলপূর্বক কাজ নেয়া হয়, তখন মন অন্ধ হয়ে যায়। বিবাহের চতুর্থ উপকারিতা হচ্ছে, ঘরকন্নার ব্যবস্থাপনা তথা রান্নাবান্না করা, ঝাড় দেয়া, বিছানা করা ও থালাবাসন মাজা। কেননা, গৃহে পুরুষ একা থাকলে এসব কাজ করা তার জন্যে কঠিন হবে। এতে তার অনেক সময় নষ্ট হবে। ফলে এলেম ও আমলের জন্যে অবসর পাবে না। এদিক দিয়ে সাধ্বী নারী ঘরকন্নার ব্যবস্থাপনা করে তার স্বামীর ধর্মকর্মে সহায়তা করে। এ কারণেই আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ সাধ্বী সুনিপুণা স্ত্রী নিয়ে সংসার করা দুনিয়াদারীর মধ্যে গণ্য হয় না। কেননা, তার মাধ্যমে পুরুষ আখেরাতের কাজ করার সময় পায়।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ۔

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে দুনিয়াতে পুণ্য দান কর।

–এ আয়াতের তফসীরে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেন ঃ এখানে দুনিয়ার পুণ্য বলে সুশীলা সুনিপুণা স্ত্রী বুঝানো হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন ঃ বান্দাকে ঈমানের পর ভাগ্যবতী স্ত্রীর চেয়ে উত্তম কোন কিছু দেয়া হয়নি। স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আশীর্বাদ হয়ে থাকে যে, কোন দান তাদের বিনিময় হতে পারে না। আবার কতক এমন গলার বেড়ী হয় যে, তাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণের বিনিময়েও রেহাই পাওয়া যায় না। রসূলে আকরাম (সাঃ)-এরশাদ করেন ঃ হযরত আদম (আঃ)-এর উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব দু'টি বিষয়ে– এক, তাঁর স্ত্রী অবাধ্যতার কাজে তাঁর মদদগার ছিল। আর আমার পত্নী আল্লাহ তাআলার আনুগত্যমূলক কাজে আমার সাহায্য করে। দ্বিতীয়, তাঁর শয়তান কাফের ছিল আর আমার শয়তান মুসলমান হয়ে গেছে। সে ভাল কাজ ছাড়া কিছু আদেশ করে না। মোট কথা, এটাও এমন এক উপকারিতা, যা সৎলোকেরা কামনা করে, কিন্তু এ উপকারিতার পূর্বশর্ত হচ্ছে, দু'পত্নী থাকা চলবে না। কেননা, দু'পত্নী থাকলে প্রায়ই পারিবারিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং জীবন নিরানন্দ হয়ে যায়।

বিবাহের পঞ্চম উপকারিতা, এতে নফসের বিরুদ্ধে সাধনা করা হয়।

কেননা, পরিবার-পরিজনের হক আদায় করা, তাদের আচার-আচরণ মনের বিরোধী হলেও সবর করা, তাদের জন্যে কষ্ট করা, তাদের সংশোধনের চেষ্টা করা, তাদেরকে ধর্মের পথ বলে দেয়া, তাদের খাতিরে হালাল উপার্জনে অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করা এবং তাদের লালনপালন করা– এসবই অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ কাজ। কেননা, এগুলো প্রজাপালন ও রাজ্যশাসনতুল্য। স্ত্রী ও পুত্র-পরিজন হচ্ছে প্রজা। প্রজার হেফাযত উচ্চস্তরের কাজ। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

يوم من وال عادل افضل من عبادة سبعين سنة ۔

অর্থাৎ, ন্যায়পরায়ণ শাসকের একদিন সত্তর বছর এবাদত অপেক্ষা উত্তম।

বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি নিজের ও অপরের সংশোধনে আত্মনিয়োজিত, সে সেই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, যে কেবল নিজের সংশোধনে মশগুল। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি উৎপীড়ন সহ্য করে, সে তার মত নয়, যে নিজেকে স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামে মত্ত রাখে। মোট কথা, স্ত্রী-পুত্র পরিজনের চিন্তাভাবনা করা আল্লাহর পথে জেহাদ করার মতই। তাই বিশরে হাফী (রাহঃ) বলেছিলেন ঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আমার উপর তিন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন। তন্মধ্যে একটি, তিনি নিজের জন্যে ও অপরের জন্যে হালাল রুজি অন্বেষণ করেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ মানুষ পরিবার-পরিজনের জন্যে যা ব্যয় করে তা খয়রাততুল্য। মানুষ সেই লোকমারও সওয়াব পায় যা সে তার স্ত্রীর মুখে তুলে দেয়। এক বুযুর্গ জনৈক আলেমের কাছে বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রত্যেক আমল থেকে কিছু অংশ দিয়েছেন, এমন কি, হজ্জ জেহাদ ইত্যাদি থেকেও। আলেম বললেন ঃ তোমাকে আবদালের আমল তো দেয়াই হয়নি। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবদালের আমল কি উত্তর হল– হালাল উপার্জন করা এবং পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করা। ইবনে মোবারক যখন তাঁর ভাইদের সাথে জেহাদে ছিলেন, তখন একদিন বললেন ঃ তোমরা সেই আমল জান কি, যা আমাদের এই জেহাদ অপেক্ষা উত্তম, তারা বললেন ঃ না, আমরা জানি না। তিনি বললেন ঃ আমি জানি। প্রশ্ন হল ঃ সেটা কি? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি সন্তানওয়ালা হওয়া সত্ত্বেও কারও কাছে কিছু চায় না, রাতে জেগে ছা-বাচ্চাদেরকে তৃপ্ত দেখে এবং তাদেরকে আপন কাপড় দ্বারা ঢেকে দেয়, তার আমল আমাদের এই

জেহাদের চেয়ে উত্তম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من حسنت صلاته وكثر عياله وقل ماله ولم يغتب
المسلمين كان معى فى الجنة كهاتين .

অর্থাৎ, যার নামায ভাল হয়, পরিবার-পরিজন বেশী হয়, অর্থসম্পদ কম হয় এবং যে মুসলমানদের পশ্চাৎ নিন্দা করে না, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।

অন্য এক হাদীসে আছে–

ان الله يحب الفقير المتعفف بالعيال

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ নিঃস্ব, সংযমী, পরিজনশীলকে ভালবাসেন।

হাদীসে আরও আছে– বান্দার গোনাহ অনেক হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তাকে পরিবার-পরিজনের চিন্তায় লিপ্ত করে দেন, যাতে তার গোনাহ দূর হয়ে যায়। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ বলেন ঃ কিছু গোনাহ এমন আছে, তাঁর কাফফারা পরিবার-পরিজন ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ সম্পর্কে এক হাদীসে আছে, কিছু গোনাহ এমন আছে, যা জীবিকা উপার্জনের চিন্তা ছাড়া অন্য কোন কিছু দূর করতে পারে না।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

من كان له ثلث بنات فانفق عليهن واحسن اليهم حتى
يغنيهن الله عنه اوجب الله له الجنة البتة الا ان يعمل ما
لايغفرله .

অর্থাৎ, যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান থাকে এবং সে তাদের ভরণপোষণ করে ও ততদিন তাদের দেখাশোনা করে, যতদিন আল্লাহ্ তাদেরকে স্বনির্ভর করে না দেন, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে নিশ্চিতরূপে জান্নাত ওয়াজিব করে দেন, কিন্তু সে ক্ষমার অযোগ্য কোন গোনাহ করলে ভিন্ন কথা।

কথিত আছে, জনৈক বুযুর্গ তার স্ত্রীর সাথে খুব সম্প্রীতি সহকারে বসবাস করতেন। অবশেষে একদিন স্ত্রী মারা গেল। লোকেরা তাঁকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে বললে তিনি বললেন ঃ না, আমার মানসিক শান্তির জন্যে একজনই যথেষ্ট ছিল। এর কিছুদিন পর বুযুর্গ বললেন ঃ স্ত্রীর মৃত্যুর

এক সপ্তাহ পরে আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন আকাশের দরজা উম্মুক্ত করে কিছু লোক অবতরণ করছে এবং একে অপরের পেছনে শূন্যে চলে আসছে। যখন একজন আমার নিকটে নামে, তখন আমাকে দেখে তার পেছনের জনকে বলে ঃ অলক্ষুণে এ ব্যক্তিই। পেছনের জন বলে, হাঁ। এমনিভাবে তৃতীয় জন চতুর্থ জনকে বলে এবং সে হাঁ বলে। আমি ভয়ে তাদেরকে ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করতে পারি না। অবশেষে সকলের পরে এক বালক আমার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় আমি বললাম ঃ মিয়া, সে হতভাগা কে, যার দিকে তোমরা ইশারা করছ? বালকটি বলল ঃ সে তুমি। আমি বললাম, এর কারণ কি? সে বলল ঃ যারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে, আমরা তাদের আমলের সাথে তোমার আমল উপরে নিয়ে যেতাম, কিন্তু এক সপ্তাহ ধরে আমাদের প্রতি আদেশ হয়েছে যাতে আমরা তোমার আমল জেহাদে পশ্চাৎপদ ব্যক্তিদের আমলের সাথে লিপিবদ্ধ করি। আমরা জানি না তুমি নতুন কি কান্ড করেছ, যার কারণে এই আদেশ হয়েছে। এর পর সেই বুযুর্গ তার সঙ্গীদেরকে বিবাহ করিয়ে দিতে বললেন এবং অবশিষ্ট জীবন স্ত্রী-পরিজনের সাথে অতিবাহিত করলেন।

বর্ণিত আছে, কিছু লোক পয়গম্বর হযরত ইউনুস (আঃ)-এর গৃহে মেহমান হল। তিনি মেহমানদের আদর আপ্যায়নের জন্যে যখন অন্দরে আসা-যাওয়া করতেন, তখনই স্ত্রী তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করত এবং কটু কথা বলত, কিন্তু তিনি চুপ থাকতেন। মেহমানরা তাঁর এই সহনশীলতা দেখে অবাক হল। তিনি বললেন ঃ অবাক হবেন না। কেননা, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, পরকালে আমাকে যে শাস্তি দেয়ার আছে তা দুনিয়াতেই দিয়ে দিন। এতে এরশাদ হল, তোমার শাস্তি অমুক ব্যক্তির কন্যা। তাকে বিবাহ করে নাও। সেমতে আমি তাকে বিবাহ করেছি। আপনারা যে দুর্ব্যবহার দেখলেন, তাতে আমি সবর করি। এসব বিষয়ে সবর করলে ক্রোধ দমিত এবং অভ্যাস সংশোধিত হয়। কেননা, যে ব্যক্তি একা অথবা কোন সদাচারীর সঙ্গী হয়ে থাকে, তার নফসের মালিন্য ফুটে উঠে না এবং অভ্যন্তরীণ নষ্টামি প্রকাশ পায় না। তাই এ ধরনের ঝামেলায় ফেলে নিজেকে পরীক্ষা করা এবং সবরের অভ্যাস গড়ে তোলা আধ্যাত্ম পথের পথিকের জন্যে অপরিহার্য। এতে তার অভ্যাস সুষম এবং অন্তর নিন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পাকসাফ হয়ে যাবে।

পরিবার পরিজনের জন্যে সবর করাও একটি এবাদত। মোট কথা, এটাও বিবাহের একটি উপকারিতা, কিন্তু এ থেকে কেবল দু'প্রকার বক্তিই উপকৃত হতে পারে– (১) যে সাধনা, কঠোর পরিশ্রম ও চরিত্র সংশোধনের ইচ্ছা করে, তার জন্যে এর মাধ্যমে সাধনার পথ জানা হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। অথবা, (২) যে ব্যক্তি চিন্তাভাবনা ও অন্তরের গতিবিধি থেকে মুক্ত এবং কেবল বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি করে নেয়, এরূপ ব্যক্তির জন্যে স্ত্রী, পরিবার পরিজনের জন্যে হালাল উপার্জন এবং তাদের লালন পালন দৈহিক এবাদতের চেয়ে উত্তম। কেননা, দৈহিক এবাদতের ফায়দা অপরে পায় না। আর যে ব্যক্তি মূল মজ্জার কি দিয়ে সংশোধিত চরিত্রের অধিকারী অথবা পূর্ব সাধনার কারণে যার অভ্যাস মার্জিত, তার জন্যে এই উপকারিতার উদ্দেশে বিবাহ করা জরুরী নয়। কেননা, প্রয়োজনীয় সাধনা ও কঠোর পরিশ্রম তার অর্জিতই রয়েছে।

বিবাহের কারণে সৃষ্ট বিপদাপদ ঃ প্রথম বিপদ হালাল রুজি-রোজগারে অক্ষম হওয়া। এটা সর্বাধিক মারাত্মক বিপদ। কেননা, প্রত্যেকেই হালাল রুজি-রোজগার করতে পারে না, বিশেষতঃ বর্তমান যুগে যখন জীবন যাপন পদ্ধতি ক্রমশই অধঃপতিত হচ্ছে, তখন মানুষ বিবাহ করলে বিবাহের কারণে অর্থের অন্বেষণও বেশী হবে। সে হারাম দ্বারা পরিবার-পরিজনকে খাওয়াতে বাধ্য হবে। ফলে নিজেও ধ্বংস হবে এবং অন্যকেও ধ্বংস করবে। পক্ষান্তরে যে অবিবাহিত, সে এই বিপদ থেকে মুক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ হয় হয় যে, পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মন্দ জায়গায় ঢুকে পড়ে এবং স্ত্রীর মনোবাঞ্ছা পূরণের পেছনে পড়ে ইহকালের বিনিময়ে স্বীয় পরকাল বিক্রি করে দেয়। এক হাদীসে আছে বান্দাকে দাঁড়িপাল্লার নিকটে দাঁড় করা হবে। তার কাছে পাহাড়সম পুণ্য থাকবে। তখন তাকে পরিবার পরিজনের দেখাশুনা ও খেদমত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে এবং অর্থ সম্পদের অবস্থা জিজ্ঞেস করা হবে, কি উপায়ে উপার্জন করেছে এবং কিসে ব্যয় করেছে, অবশেষে এসব দাবী পূরণ তার সমস্ত পুণ্য নিঃশেষ হয়ে যাবে। তার কাছে কোন পুণ্যই থাকবে না। তখন ফেরেশতারা সজোরে বলবে– এই ব্যক্তির পরিবার-পরিজন দুনিয়াতে তার সমস্ত নেকী খেয়ে ফেলেছে। আজ সে তার আমলের বিনিময়ে বন্ধক হয়ে গেছে।

কথিত আছে, কেয়ামতে সর্বপ্রথম মানুষকে যারা জড়িয়ে ধরবে, তারা হবে তার পরিবার-পরিজন। তারা তাকে আল্লাহ্ তাআলার সামনে দাঁড় করিয়ে বলবে ঃ ইলাহী, তার কাছ থেকে আপনি আমাদের প্রতিদান নিন। আমরা যা জানতাম না, সে আমাদেরকে তা বলেনি এবং আমাদের অজ্ঞাতে আমাদেরকে হারাম খাইয়েছে। এর পর তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দা দ্বারা পাপ কাজ করাতে চান, তখন দুনিয়াতে তার উপর দংশনকারী আযাব চাপিয়ে দেন, যে তাকে দংশন করতে থাকে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি পরিবার পরিজন মূর্খ হওয়ার চেয়ে বড় কোন গোনাহ্ নিয়ে আল্লাহ্ তাআলার কাছে যাবে না। মোট কথা, এ বিপদটি এমন ছড়িয়ে পড়েছে যে, এ থেকে কম লোকই মুক্ত হবে। হাঁ, যার কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অথবা হালাল উপায়ে উপর্জিত যথেষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদ রয়েছে এবং সে অল্পে তুষ্ট ও অধিক ধন-সম্পদ অন্বেষণ থেকে বিরত, সে এই বিপদ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। ইবনে সালেম (রহঃ)-কে কেউ বিবাহ করার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আমাদের এ যুগে বিবাহ করা তার জন্যেই উত্তম, যার কামস্পৃহা গাধার মত প্রবল। গাধা মাদীকে দেখলে শত পিটুনি খেয়েও তার কাছ থেকে সরে না। পক্ষান্তরে যার নফস তার আয়ত্তে থাকে, তার জন্যে বিবাহ না করা উত্তম।

বিবাহের দ্বিতীয় বিপদ হচ্ছে পরিবার-পরিজনের হক আদায় করতে, তাদের আচার অভ্যাসে সবর করতে এবং তাদের পীড়নে সহনশীল হতে অক্ষমতা। এ বিপদটি প্রথম বিপদের তুলনায় কম। কেননা, এতে সক্ষম হওয়া প্রথমটিতে সক্ষম হওয়ার তুলনায় সহজ। নারীদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখা, তাদের হক আদায় করা, হালাল রুজি অন্বেষণের মত কঠিন নয়, কিন্তু এতে অবশ বিপদাশংক্যা আছে। কেননা, স্ত্রী, পুত্র-পরিজন প্রজাতুল্য। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول . মানুষ যাদের ভরণ পোষণ করে তাদের হক নষ্ট করা গোনাহগার হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। বর্ণিত আছে, যেব্যক্তির পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে পলায়ন করে, সে সেই পলাতক গোলামের মত, যে তার প্রভুর কাছ থেকে পলায়ন করে। পরিবার পরিজনের মধ্যে ফিরে না আসা পর্যন্ত

তার নামায রোযা কিছুই কবুল হয় না। আর যে ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনের হক আদায় করতে অক্ষম, সে তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকলেও পলাতক গোলামেরই মত। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। এতে নিজেকে এবং পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে বলা হয়েছে। মানুষ কখনও নিজের হকও আদায় করতে পারে না। এমতাবস্থায় বিবাহ করলে তার উপর দ্বিগুণ হক ওয়াজিব হয়ে যাবে। নিজের সাথে অন্যও শামিল হবে। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বিবাহ করতে আপত্তি করেন এবং বলেন ঃ আমি নিজেকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। এর উপর অন্যকে কিরূপে সংযুক্ত করি। অনুরূপভাবে হযরত ইব্রাহীম আদহাম বিবাহ করতে অস্বীকৃত হন এবং বলেন ঃ আমি নিজের কারণে কোন মহিলাকে বিপদে ফেলতে চাই না। অর্থাৎ, তার হক আদায় করতে এবং তার উপকার করতে আমি অক্ষম। বিশরে হাফীও এমনি ওযর পেশ করে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার এই উক্তি আমার বিবাহের পথে বাধা– وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ নারীদেরও তেমনি হক রয়েছে, যেমন তাদের কাছে অন্যের হক রয়েছে।

সারকথা, এটাও একটা ব্যাপক বিপদ, যদিও প্রথম বিপদের তুলনায় এর ব্যাপকতা কম। এ বিপদ থেকে এমন ব্যক্তিই নিরাপদ থাকবে যে বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, নারী চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ, তাদের কটু কথায় ধৈর্যশীল এবং তাদের হক আদায় করতে আগ্রহী, কিন্তু এখন তো অধিকাংশ লোক বির্বোধ, কটুভাষী, কঠোর স্বভাব এবং বেইনসাফ, যদিও নিজের জন্যে খুব ইনসাফ প্রত্যাশী। এরূপ লোকদের জন্যে অবিবাহিত থাকাই অধিক নিরাপদ।

বিবাহের তৃতীয় বিপদ, স্ত্রী-পুত্র পরিজন মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে এবং দুনিয়াদারীর দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়। এ বিপদটি প্রথমোক্ত দু'বিপদের তুলনায় কম ব্যাপক। এ বিপদে মানুষের অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, সে পরিবার পরিজনের জীবিকা নির্বাহের জন্যে অগাধ সাজ-সরঞ্জাম সঞ্চয় করতে ও তা রেখে যেতে সচেষ্ট হয়। বলাবাহুল্য, যেসব বিষয় আল্লাহর স্মরণে বাধা সৃষ্টি করে তা পরিবার পরিজন হোক

অথবা অর্থ-সম্পদ হোক, সমস্তই অমঙ্গলজনক হয়ে থাকে। আমাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, এসব বিষয় তাকে কোন নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত করে দেবে। কেননা, এটা তো প্রথম ও দ্বিতীয় বিপদে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে; বরং উদ্দেশ্য, স্ত্রী পুত্র পরিজনের কারণে মানুষ বৈধ বস্তু দ্বারা বিলাসব্যসন, হাসি-তামাশা ও উপভোগে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। বিবাহের কারণে এ ধরনের ব্যস্ততা বহুলাংশে বেড়ে যায়। মন এগুলোতে ডুবে যায় সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্য গড়িয়ে রাত হয়ে গেলেও মানুষ আখেরাতের চিন্তা ও প্রস্তুতি গ্রহণের ফুরসত পায় না। এরূপ ক্ষেত্রেই হযরত ইব্রাহীম আদহাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নারীর হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে বসে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তার দ্বারা কিছুই হতে পারে না। আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিবাহ করে, সে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। অর্থাৎ, বিবাহ দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণ হয়।

এ পর্যন্ত বিবাহের উপকারিতা ও অপকারিতা পূর্ণরূপে বর্ণিত হল। এখন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্যে বিবাহ করা উত্তম, না অবিবাহিত থাকা উত্তম, তা সর্বাবস্থায় বলা যায় না। কেননা, এসব বিষয় থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া যায় না। বরং নির্দিষ্ট ব্যক্তির কর্তব্য হবে এসব উপকারিতা অপকারিতাকে কষ্টিপাথর মনে করে তাতে নিজের অবস্থা পরখ করা। যদি নিজের মধ্যে অপকারিতা না পায় এবং উপকারিতা বিদ্যমান থাকে, তবে জেনে নেবে, বিবাহ করাই তার জন্যে উত্তম। উদাহরণতঃ যদি তার কাছে হালাল অর্থসম্পদ বিদ্যমান থাকে, সে সচ্চরিত্রবান হয়, এমন পাকা দ্বীনদার হয় যে, বিবাহের কারণে আল্লাহ্র স্মরণে পার্থক্য হবে না এবং সর্বোপরি যৌবনের কারণে কামস্পৃহা দমিত করার প্রয়োজন থাকে, তবে তার জন্যে বিবাহ করা নিশ্চিতরূপেই উত্তম। আর যদি এসব উপকারিতা অনুপস্থিত থাকে এবং অপকারিতা বিদ্যমান থাকে, তবে নিঃসন্দেহে অবিবাহিত থাকা, তার জন্যে শ্রেয়। পক্ষান্তরে যদি উপকারিতা ও অপকারিতা উভয়টি বিদ্যমান থাকে, যেমন– আমাদের যুগে এটাই প্রবল, তবে ন্যায়ের মানদণ্ডে পরিমাপ করতে হবে যে, উপকারিতা দ্বারা তার দ্বীনদারী কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং অপকারিতা দ্বারা ক্ষতি কতটুকু হবে, যদি প্রবল ধারণা একদিকে হয়ে যায়, তবে সেই অনুযায়ী মীমাংসায়

উপনীত হবে। উদাহরণতঃ দুটি উপকারিতা অধিক প্রকাশমান– সন্তান হওয়া এবং কামস্পৃহা দমিত হওয়া। তদনুরূপ বিপদও দুটি অধিক দেখা যায়, একটি হারাম উপার্জনের প্রয়োজন এবং অপরটি আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত হওয়া। এখন আমরা চারটিকেই একটি অপরটির বিপরীতে ধরে নিয়ে বলি, যদি কোন ব্যক্তি কামস্পৃহার কষ্টে না থাকে এবং বিবাহের উপকারিতা কেবল সন্তান হওয়াই হয়, তবে উল্লিখিত দুটি অপকারিতা বিদ্যমান থাকলে তার জন্যে অবিবাহিত থাকাই উত্তম। কেননা, যে বিষয়ে আল্লাহর স্মরণে বাধা হয়, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই এবং হারাম উপার্জনেও কল্যাণ নেই। এ দুটি অপকারিতার কারণে যে ক্ষতি হবে, তা কেবল সন্তানের জন্যে চেষ্টা করার উপকারিতা দ্বারা পূরণ হবে না কেননা, সন্তানের জন্যে বিবাহ করলে সন্তানের জীবন যাপনের ব্যাপারেও চেষ্টা করা হয়, কিন্তু এই জীবন একটি অনিশ্চিত বিষয়। অথচ দ্বীনদারীতে অপকারিতার ক্ষতি নিশ্চিত। দ্বীনদারীকে নির্বিঘ্ন রাখার মধ্যেই কল্যাণ। কেননা, দ্বীনদারী হচ্ছে পুঁজি। এটা নষ্ট হয়ে গেলে আখেরাতের জীবন বরবাদ হয়ে যায়। বলাবাহুল্য সন্তানের কল্যাণ উপরোক্ত দুটি বিপদের একটিরও বিপরীত হতে পারে না। তবে যদি সন্তানের সাথে কামস্পৃহা দমিত করার প্রয়োজনও অধিকতর প্রবল হয় তবে দেখতে হবে, বিবাহ না করলে যদি যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশংক্ষা থাকে, তবে তার জন্যে বিবাহ করা উত্তম। কেননা, যে দুতরফা বিপদে ফেঁসে গেছে– বিবাহ না করলে যিনায় লিপ হবে এবং করলে হারাম উপার্জন করবে। উভয়েরর মধ্যে হারাম উপার্জন যিনার তুলনায় কম মারাত্মক। যদি বিশ্বাস রাখে যে, সে বিবাহ না করলে যিনায় লিপ্ত হবে না, কিন্তু দৃষ্টি নত রাখতে সক্ষম হবে না, তবে বিবাহ না করা ভাল। কেননা পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং হারাম উপার্জন করা উভয়টি হারাম হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তা এই যে, হারাম উপার্জন সব সময় হয় এবং এর কারণে সে নিজে এবং পরিবারের সকলেই গোনাহগার হয়, কিন্তু কুদৃষ্টি কদাচিত হয় এবং এ কারণে বিশেষভাবে সে নিজেই গোনাহগার হয়, অন্য কেউ তাতে শরীক হয়। এছাড়া এটা দ্রুত শেষও হয়ে যায়। কুদৃষ্টি যদিও চোখের যিনা, কিন্তু হারাম খাওয়ার তুলানায় এটা দ্রুত মাফ হতে পারে। তবে

যদি কুদৃষ্টির কারণে যিনায় লিপ্ত হবার ভয় থাকে, তবে তার অবস্থাও যিনায় লিপ্ত হবার ভয়ের মতই। মোট কথা, উপরোক্ত বিপদসমূহকে উপকারিতার সাথে তুলনা করে তদনুযায়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত। যেব্যক্তি এসব রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবে, তার জন্যে পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের বর্ণিত বিভিন্নমুখী অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হবে না। কেননা, বিবাহের প্রতি উৎসাহ এবং অনীহা অবস্থাভেদে উভয়টিই সঠিক। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, বিপদাপদ মুক্ত ব্যক্তির জন্যে এবাদতের উদ্দেশে অবিবাহিত থাকা উত্তম, না বিবাহ করা উত্তম, তবে এর জওয়াবে আমরা বলি, তার জন্যে উভয়টিই উত্তম। কেননা বিবাহ স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে এবাদতের পরিপন্থী নয়, বরং এ দৃষ্টিতে পরিপন্থী যে, এতে অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং হালাল পথে অর্থ উপার্জনে সক্ষম হলে বিবাহও উত্তম। কারণ, দিবারাত্র চব্বিশ ঘন্টা এবাদত করা এবং এক মুহূর্তও আরাম না করা সম্ভবপর নয়। যদি ধরে নেয়া যায় যে, এক ব্যক্তি সর্বক্ষণ অর্থোপার্জনে ব্যয়িত হয় এবং পাঞ্জেগানা ফরয নামায, পানাহার ও প্রস্রাব পায়খানার সময় ছাড়া নফল এবাদতের জন্যে কোন সময় থাকে না, তবে তার জন্যেও বিবাহ করা ভাল। কেননা, হালাল অর্থোপার্জন, স্ত্রী পুত্র পরিজনের খেদমত, সন্তান লাভের প্রয়াস এবং নারী স্বভাবে সবর করার মধ্যেও নানা প্রকার এবাদত নিহিত রয়েছে, যার সওয়াব নফল এবাদতের চেয়ে কম নয়। পক্ষান্তরে যদি সে এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়, যারা জ্ঞান, চিন্তাভাবনা ও অন্তরের ভ্রমের মাধ্যমে এবাদত করে এবং বিবাহ করলে এবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে তার জন্যে বিবাহ না করা উত্তম।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, বিবাহ করা উত্তম হলে হযরত ঈসা (আঃ) বিবাহ করলেন না কেন এবং আল্লাহর এবাদত উত্তম হলে হযরত রসূলে মকবুল (সাঃ) এত অধিক বিবাহ করলেন কেন, তবে এর জওয়াব এই যে, যেব্যক্তি সক্ষম, উচ্চ সাহসী এবং অধিক শক্তির অধিকারী, তার জন্যে উভয় বিষয়ই উত্তম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) চূড়ান্ত পর্যায়ের শক্তি ও সাহসের অধিকারী ছিলেন তাই তিনি উভয় মাহাত্ম অর্জন করেছেন, অর্থাৎ, নয় পত্নীর স্বামী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর এবাদতে মশগুল ছিলেন এবং

বিবাহ তাঁর জন্যে এবাদতে প্রতিবন্ধক হয়নি। যেমন জগতের বড় বড় দার্শনিকদের জন্যে প্রস্রাব-পায়খানার কাজ পার্থিব চিন্তাভাবনায় বাধা সৃষ্টি করে না, তারা বাহ্যতঃ প্রস্রাব পায়খানার কাজে মশগুল থাকেন এবং তাঁদের অন্তর আপন অভীষ্ট কর্মে নিমজ্জিত থাকে তেমনি রসূলে পাক (সাঃ)ও আপন উচ্চ মর্যাদার কারণে দুনিয়ার কাজকর্ম করার সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত থাকতেন এবং এতে কোন বাধা অনুভব করতেন না। এ কারণেই এমন সময়েও তাঁর প্রতি ওহী নাযল হত, যখন তিনি নিজের পত্নীর সাথে শয্যায় থাকতেন। অন্য কোন ব্যক্তির জন্যে এই মর্যাদা ধরে নেয়া সম্ভব, কিন্তু সাথে সাথে একথাও বুঝতে হবে যে, নর্দমা সামান্য খড়কুটা দ্বারা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সমুদ্রে এ কারণে কোন পরিবর্তন আসতে পারে না। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুরূপ অন্যকে মনে করা অনুচিত। হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিবাহ না করার কারণ, তিনি নিজের ক্ষমতার পতি লক্ষ্য করে সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। অথবা সম্ভবতঃ তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, তাতে পারিবারিক ব্যস্ততা ক্ষতিকর হত অথবা তাতে বিবাহ ও এবাদত উভয়টি একত্রে সম্পাদন করা সম্ভবপর ছিল না। তাই তিনি এবাদতের পথই বেছে নিয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ বন্ধনের শর্ত চতুষ্টয়
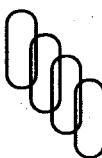
প্রথম ওলী তথা অভিভাবকের অনুমতি। মহিলার কোন অভিভাবক না থাকলে শাসনকর্তার অনুমতি তার স্থলবর্তী হবে। দ্বিতীয় মহিলা প্রাপ্ত বয়স্কা বা পূর্ব বিবাহিতা হলে তার সম্মতি। যদি কুমারী হয় এবং পিতা অথবা দাদা ছাড়া অন্য কেউ অভিভাবক হয়, তাহলেও মহিলার অনুমতি শর্ত। তৃতীয়তঃ দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতি, যারা বাহ্যতঃ বিশ্বাস্ত হবে, অর্থাৎ, অপকর্মের তুলনায় সৎকর্ম বেশী করে এমন । যদি এমন দুজন সাক্ষী উপস্থিত থাকে, যাদের অবস্থা জানা নেই, তবুও বিবাহ হয়ে যাবে। চতুর্থ ইজাব ও কবুল হওয়া।

বিবাহ বন্ধনের আদব ঃ প্রথমতঃ পাত্রীর অভিভবকের সাথে পূর্বাহ্নে যোগাযোগ স্থাপন করবে, কিন্তু পাত্রী ইদ্দতে থাকলে পয়গাম দেবে না। ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর পয়গাম দেবে। অনুরূপভাবে যদি অন্য কেউ বিবাহের পয়গাম দিয়ে থাকে, তবে তার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত পয়গাম দেবে না। হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আছে। দ্বিতীয়তঃ পূর্বে খোতবা হবে এবং ইজাব কবুলের সাথে হামদ ও নাত থাকবে। উদাহরণতঃ ওলী বলবে– আলহামদু লিল্লাহ ওয়াস্‌সালাতু আলা রসূলিল্লাহ্, আমি নিজের অমুক কন্যাকে তোমার বিবাহে দিলাম। বর বলবে– আলহামদু লিল্লাহ ওয়াস সালাতু আলা রসূলিল্লাহ্, আমি এই মোহরানার বিনিময়ে তার বিবাহ কবুল করলাম। মোহরানা নির্দিষ্ট ও কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। হামদ ও নাত খোতবার পূর্বেও মোস্তাহাব। তৃতীয়তঃ কনে কুমারী হলে বরের হাল অবস্থা কনের শ্রুতিগোচর করা উচিত। কেননা, এটা পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালবাসার জন্যে উপযুক্ত। এ কারণেই বিবাহের পূর্বে কনে দেখে নেয়াও মোস্তাহাব। চতুর্থত ঃ দুজন সাক্ষী ছাড়া আরও কিছু সৎলোকের বিবাহ মজলিসে উপস্থিত থাকা উচিত। পঞ্চমতঃ বিবাহে সুন্নত পালন, দৃষ্টি নত রাখা, সন্তান লাভ করা এবং এর বর্ণিত উপকারিতাসমূহের নিয়ত করবে– কেবল মনের কামনা চরিতার্থ করা লক্ষ্য না হওয়া কর্তব্য। অন্যথায় এই বিবাহ দুনিয়ার কাজে গণ্য হবে। মনের কামনা থাকা উপরোক্ত তিনটি নিয়তের পরিপন্থী নয়।

অধিকাংশ এবাদতকর্ম মনের খাহেশের অনুকূল হয়ে যায়। মোস্তাহাব হল বিবাহ মসজিদে ও শওয়াল মাসে করা। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে আমার বিবাহও শওয়াল মাসে হয় এবং আমরা প্রথম শওয়াল মাসেই মিলিত হই।

কনের অবস্থা ঃ কনের অবস্থা সম্পর্কে দু'প্রকার বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথম, বিবাহের পরিপন্থী বিষয়াদি থেকে কনে মুক্ত কিনা তা দেখার দরকার এবং দ্বিতীয়, দেখা উচিত, তাকে বিবাহ করলে জীবন সুন্দরভাবে অতিবাহিত হবে কিনা এবং উদ্দেশ্য হাসিল হবে কিনা।

নিম্নে বিবাহের পরিপন্থী বিষয়াদি বর্ণিত হচ্ছে ঃ

১। অন্য কোন ব্যক্তির বিবাহিত স্ত্রী হওয়া। ২। অন্য স্বামীর কাছে থেকে তালাকপ্রাপ্তির পর অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর তার ইদ্দতে থাকা। ৩। মুখে কোন কুফরী কলেমা উচ্চারণ করার কারণে ধর্মত্যাগী হওয়া। ৪। অগ্নিপূজারী হওয়া। ৫। মূর্তিপূজারী ও যিনদীক হওয়া অর্থাৎ কোন ঐশী গ্রন্থ ও পয়গম্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত না হওয়া। এমন নারীও এর অন্তর্ভুক্ত, যার মাযহাব হচ্ছে হারাম বস্তুকে হালাল মনে করা অথবা এমন বিষয়ে বিশ্বাস করা, যার বিশ্বাসীকে শরীয়ত কাফের বলে। এ ধরনের কোন নারীকে বিবাহ করা দুরস্ত নয়। ৬। যে সকল আত্মীয়কে বিবাহ করা হারাম, কনে তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া অর্থাৎ মা, নানী, দাদী, কন্যা, পৌত্রী, দৌহিত্রী, বোন, ভাতিজী, ভাগ্নেয়ী ও তাদের সকলের সন্তান, ফুফু ও খালা হওয়া। ৭। দুধ পান করার কারণে হারাম হওয়া। বলাবাহুল্য, আত্মীয়তার কারণে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম, দুধ পান করার কারণেও সেসব আত্মীয় হারাম, কিন্তু পাঁচ বারের কম দুধ পান করলে ইমাম শাফেয়ীর মতে হারাম হয় না। (ইমাম আবু হানীফার মতে একবারেও হারাম হয়ে যায়।) জামাতা হওয়ার করণে হারাম হওয়া। উদাহরণতঃ বর ইতিপূর্বে কনের কন্যা, পৌত্রী অথবা দৌহিত্রীকে বিবাহ করে থাকলে এমতাবস্থায় এই কনেকে বিবাহ করতে পারে না। কেননা, কোন নারীকে কেবল বিবাহ করলেই তার মা, দাদী প্রমুখ হারাম হয়ে যায়। আর যদি সহবাসও করে, তবে তার সন্তানও হারাম হয়ে যায়। অথবা এমন কনে হওয়া, যাকে বরের পিতা অথবা পুত্র ইতিপূর্বে বিবাহ করেছে। এরূপ কনেও বরের জন্যে হারাম। ৯। কনের পঞ্চম স্ত্রী হওয়া। অর্থাৎ, বরের বর্তমানে চার স্ত্রী রয়েছে। সুতরাং পঞ্চম মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয নয়। ১০। বরের বিবাহে পূর্ব থেকে কনের ভগিনী, অথবা ফুফু অথবা খালা থাকা। কেননা, এমন দু'মহিলাকে এক সাথে বিবাহে রাখা হারাম, যাদের মধ্যে এমন আত্মীয়তা বিদ্যমান যে, একজনকে পুরুষ ধরে নিলে অন্যজনের সাথে তার বিবাহ জায়েয হয় না। ১১। এই কনেকে পূর্বে এই বরের তিন তালাক দেয়া। এরূপ তালাকপ্রাপ্তা কনে এই বরের জন্যে হালাল নয়, যে পর্যন্ত অন্য কোন পুরুষ তাকে বিবাহ করে তার সাথে সহবাস করার পর তালাক না দেবে। ১২। হজ্জ অথবা ওমরার এহরাম বাঁধা। বর ও কনের মধ্য থেকে যেকোন একজন এহরাম বাঁধলে এহরাম শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিবাহ জায়েয হবে না। ১৩। কনের পূর্ব বিবাহিতা অপ্রাপ্ত বয়স্কা হওয়া। এরূপ কনের বিবাহ প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পরেই জায়েয হবে। ১৪। কনের পূর্ববিবাহিতা এতীম হওয়া। এরূপ কনের বিবাহও প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পরই, জায়েয হবে।

এখন সুন্দর জীবন যাপন ও উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার জন্যে কনের যেসমস্ত সদগুণের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত, সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

প্রথম, কনের সতী ও দ্বীনদার হওয়া উচিত। এটি মূল গুণ। এদিকে খেয়াল রাখা খুবই জরুরী। কেননা, কনে যদি নীচ জাত, অসতী ও কম দ্বীনদার হয়, তবে বরের দুর্ভোগের অন্ত থাকবে না। সমাজে তার মুখ কাল হবে এবং তার জীবন তিক্ত হয়ে যাবে। যদি সে আত্মসম্মানী হয়, তবে আজীবন বিপদ ও দুঃখে পতিত থাকবে। আর যদি মুখ বুজে থাকে, তবে নিজের দ্বীনদারী ও ইযযত কলংকিত হবে। অসতী হওয়ার সাথে যদি কনে সুন্দরীও হয়, তবে তো ঘোর বিপদ। কেননা, বর তাকে বিচ্ছিন্ন করাও পছন্দ করবে না এবং তার অপকর্ম সইতেও পারবে না। তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মতই হবে, যে রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করেছিল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী কোন স্পর্শকারীর হাতকে ফিরিয়ে দেয় না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। সে আরজ করল ঃ আমি তাকে ভালবাসি। তিনি বললেন ঃ তবে তাকে থাকতে দাও। এ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) থাকতে দাও বলেছেন। কেননা, তিনি আশংকা করেছেন, এ ব্যক্তি তালাক দিয়ে দিলে আসক্তির কারণে তার পশ্চাদ্ধাবন করবে এবং নিজেও বরবাদ হয়ে যাবে। আর যদি কনের দ্বীনদারী এমন খারাপ হয় যে, সে স্বামীর অর্থ-সম্পদ

বিনষ্ট করে, তাহলেও জীবন দুর্বিষহ হবে। কেননা, স্বামী তার কাণ্ড কারখানায় চুপ থাকলে এবং নিষেধ না করলে তার গোনাহে শরীক হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। ফলে অসমীচীন কর্মে নিষেধ করা এ আয়াতদৃষ্টে জরুরী। পক্ষান্তরে নিষেধ করলে এবং ঝগড়াবিবাদ করলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। অন্য এক হাদীসে আছে, যেব্যক্তি কোন নারীকে তার অর্থ সম্পদ ও রূপলাবণ্যের কারণে বিবাহ করে, তাকে তার অর্থসম্পদ ও রূপ থেকে বঞ্চিত করা হয়। আর যে তার দ্বীনদারীর কারণে বিবাহ করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে অর্থসম্পদ ও রূলাবন্যে উভয়টি দান করেন। আরও বলা হয়েছে– রূপ-লাবণ্যের কারণে নারীকে বিবাহ করোনা। হয় তো তার রূপলাবণ্যই তাকে ধ্বংস করে দেবে। ধনসম্পদের কারণেও বিবাহ করবে না। হয় তো তার ধন-সম্পদই তাকে অবাধ্য করে দেবে। বরং বিবাহ দ্বীনদারীর কারণে করা উচিত। দ্বীনদারীর উপর বেশী জোর দেয়ার কারণ, দ্বীনদার নারী স্বামীর দ্বীনদারীতে সহায়ক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে দ্বীনদার না হলে স্বামীকেও দ্বীনদারী থেকে ফিরিয়ে নেয়।

দ্বিতীয় গুণ সদাচারী হওয়া। যেব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্যে ও দ্বীনদারীতে সাহায্য প্রত্যাশা করে, তার জন্যে সদাচারিণী স্ত্রী একটি বড় আর্শীর্বাদ। কেননা, স্ত্রী প্রগলভ, কটুভাষিণী ও কঠোর স্বভাব হলে তার দ্বারা উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হবে। স্ত্রীদের কটু কথায় সবর করা এমন একটি বিষয়, যা দ্বারা ওলীগণের পরীক্ষা নেয়া হয়। জনৈক আরব বলেন ঃ ছয় প্রকার নারীকে বিবাহ করো না– আন্নানা, মান্নানা, হান্নানা, হাদ্দাকা, বাররাকা ও শাদ্দাকা।

"আন্নানা" সেই নারীকে বলা হয় যে সর্বদা কাতরায় ও হায় আফসোস করতে থাকে এবং রোগিনী হয়ে থাকে। এরূপ নারীর বিবাহে কোন বরকত নেই।

"মান্নানা" সেই নারীকে বলা হয়, যে স্বামীর প্রতি প্রায়ই অনুগ্রহ প্রকাশ করে বলে, আমি তোমার জন্যে এই করেছি সেই করেছি।

"হান্নানা" সেই নারীকে বলা হয়, যে তার পূর্ব স্বামীর প্রতি অথবা তার সন্তানদের প্রতি আসক্ত থাকে।

"হাদ্দাকা" সেই নারীকে বলা হয় যে সবকিছুর উপরই লোভ পোষণ করে এবং তা পেতে চায়। এর পর তা ক্রয় করার জন্যে স্বামীকে তাগিদ দেয়।

"বাররাকা" হেজাযীদের পরিভাষায় সেই নারীকে বলা হয়, যে সারাদিন কেবল সাজসজ্জা ও প্রসাধনে মেতে থাকে। আর ইয়ামানীদের পরিভাষায় সেই নারীকে বলা হয়, যে খেতে বসে রাগ করে এবং একাই খায়। প্রত্যেক বস্তু থেকে নিজের অংশা আলাদা করে রাখে।

"শাদ্দাকা" সেই নারীকে বলে, যে খুব বকবক করে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ যেসকল অভ্যাস পুরুষের জন্য মন্দ সেগুলো নারীর জন্য প্রশংসনীয়। এ জাতীয় অভ্যাস হচ্ছে কৃপণতা, অহংকার ও ভীরুতা। কেননা, নারী কৃপণ হলে নিজের ও স্বামীর অর্থসম্পদ বাঁচিয়ে রাখবে। অহংকারী হলে প্রত্যেকের সাথে নম্র ও মোহনীয় কথাবার্তা বলতে ঘৃণা করবে। আর ভীরু হলে সবকিছুকে ভয় করে চলবে, গৃহের বাইরে যাবে না এবং স্বামীর ভয়ে অপব্যয়ের স্থান থেকে দূরে থাকবে।

তৃতীয় গুণ রূপলাবণ্য। এ গুণটিও এজন্যে কাম্য যে, এর ফলে স্বামী যিনা থেকে মুক্ত থাকে। স্ত্রী কুশ্রী হলে মানুষ স্বভাবতই অতৃপ্ত থাকে। এছাড়া যার মুখমণ্ডল সৃশ্রী হবে, তার চরিত্রও ভাল হয়। এটাই সাধারণ নিয়ম। আমরা পূর্বে লেখেছি যে, কনের দ্বীনদারীর প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী এবং রূপলাবণ্যের কারণে তাকে বিবাহ করা উচত নয়। এর অর্থ এই নয় যে, রূপলাবণ্যের প্রতি লক্ষ্য করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বরং উদ্দেশ্য এই যে, যখন দ্বীনদারীর অভাব হয়, তখন কেবল রূপলাবণ্যে আসক্ত হয়ে বিবাহ করা উচিত নয়। কেননা, শুধু সুন্দরী হওয়া বিবাহে উৎসাহিত করে ঠিক, কিন্তু দ্বীনদারীর ব্যাপারে শিথিল করে দেয়। তবে রূপলাবণ্যের কারণে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই মহব্বত ও সম্প্রীতি থাকে বিধায় এটাও লক্ষ্যণীয় বিষয়। মহব্বতের কারণাদি বিবেচনা করাতে শরীয়তও নির্দেশ দিয়েছে। এ কারণেই বিবাহের পূর্বে কনেকে দেখে নেয়া মোস্তাহাব। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরে যখন কোন মহিলাকে বিবাহ করার আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন, তখন তোমাদের উচিত তাকে দেখে নেয়া। কেননা, এটা পারস্পরিক প্রেম-প্রীতির জন্যে উপযোগী। তিনি

আরও বলেন ঃ

ان فى اعين الانصار شيئا فاذا اراد احدكم ان يتزوج منهن فلينظر اليهن .

অর্থাৎ, আনসারদের চোখে কিছু আছে। যখন তোমাদের কেউ তাদের কাউকে বিবাহ করতে চায়, তখন তাকে দেখে নেয়া উচিত। কথিত আছে, আনসাররা ক্ষীণদৃষ্টি ছিলেন। কেউ বলেন ঃ তাদের চোখ ছোট ছিল। পূর্ববর্তী কোন কোন বুযুর্গ এমন ছিলেন, যাঁরা অভিজাত পরিবারে বিবাহ করলেও পাত্রী দেখে নিতেন। আ'মাশ বলেন ঃ পূর্বে না দেখে যে বিবাহ করা হয় তার পরিণতি হয় দুঃখ কষ্ট। বলাবাহুল্য, প্রথম দৃষ্টিতে তো চরিত্র ও দ্বীনদারী জানাই যায় না— কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য জানা যায়। এ থেকে বুঝা গেল যে, রূপলাবণ্যের প্রতি খেয়াল রাখাও শরীয়তে কাম্য। বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে এক ব্যক্তি চুলে খেযাব লাগিয়ে বিবাহ করে নেয়। কয়েকদিন পর তার খেযাব সরে গেলে শ্বশুরালয়ের লোকেরা খলীফার কাছে নালিশ করে বসে যে, তারা যুবক মনে করে তার কাছে বিবাহ দিতে সম্মত হয়েছিল। খলীফা লোকটিকে শাস্তি দিলেন এবং বললেন ঃ তুমি মানুষকে বিভ্রান্ত করেছ। বর্ণিত আছে, হযরত বেলাল ও হযরত সোহায়ব রূমী (রাঃ) এক আরব পরিবারে গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব দেন। গৃহকর্তা তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে হযরত বেলাল বললেন ঃ আমি বেলাল এবং সে আমার ভাই সোহায়ব। আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। আমরা গোলাম ছিলাম, আল্লাহ আমাদেরকে মুক্ত করেছেন। আমরা নিঃস্ব ছিলাম, আল্লাহ আমাদেরকে ধনবান করেছেন। আপনারা আমাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করলে আলহামদু লিল্লাহ আর অস্বীকার করলে সোবহানাল্লাহ। অতঃপর তাদেরকে বলা হলঃ আপনাদের বিবাহ হয়ে যাবে। হযরত সোহায়ব হযরত বেলালকে বললেন ঃ হায়, তুমি আমাদের ত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রমের কথাও উল্লেখ করতে পারতে, যা আমরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে থেকে আনজাম দিয়েছি! হযরত বেলাল বললেন ঃ চুপ থাক। আমরা সত্য কথা বলে দিয়েছি। এ সততাই বিবাহ সম্পন্ন করেছে। বাহ্যিক রূপলাবণ্য ও আভ্যন্তরীণ চরিত্র উভয়ের মধ্যে ধোঁকা হতে পারে। রূপলাবণ্যের ধোঁকা

দেখার মাধ্যমে দূর করা মোস্তাহাব। চারিত্রিক ধোঁকা দোষগুণ শুনার মাধ্যমে দূর হতে পারে। তাই বিবাহের পূর্বে উভয় কাজ সেরে নেয়া উচিত, কিন্তু দোষগুণ ও চরিত্র মাধুর্য কেবল বুদ্ধিমান, সত্যবাদী এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। সে যেন কনের পক্ষ না হয় এবং শত্রুও না হয়। কেননা, ইদানীং বিবাহপূর্ব বিষয়াদিতে এবং কনের গুণ বর্ণনার ব্যাপারে মানুষের মন স্বল্পতা ও বাহুল্যপ্রবণ হয়ে গেছে। এসব ব্যাপারে সত্য কথা বলে এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম। বর্তমানে প্রবঞ্চনা ও বিভ্রান্ত করার প্রচলন অত্যন্ত বেড়ে গেছে।

মোট কথা, যেব্যক্তি কেবল সুন্নত আদায়, সন্তানলাভ ও ঘরকন্নার জন্যে বিবাহ করতে চায়, সে যদি রূপলাবণ্যের প্রতি উৎসাহী না হয়, তবে এটা সংসারবিমুখতার অধিক নিকটবর্তী। কেননা, রূপলাবণ্যও একটি পার্থিব বিষয়, যদিও মাঝে মাঝে এবং কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে এটা দ্বীনদারীতে সহায়ক হয়। হযরত আবু সোলায়মান দারানী বলেন ঃ সংসারবিমুখতা সবকিছুতেই হয়, এমনকি স্ত্রীর মধ্যেও হয়। সংসারবিমুখতা অবলম্বন করার জন্যে মানুষ কোন বৃদ্ধাকে বিবাহ করতে পারে। মালেক ইবনে দীনার বললেন ঃ মানুষ এতীম ও নিঃস্ব মহিলাকে বিবাহ করে না, যাকে খাওয়ালে পরালে সওয়াব পাওয়া যায়, ভরণপোষণ সহজ হয় এবং সামান্যতে সন্তুষ্ট থাকে; বরং তারা দুনিয়াদারদের কন্যাকে বিবাহ করে, যে সর্বদা নতুন নতুন কামনা বাসনা উপস্থিত করে বলে, আমাকে অমুক শাড়ী পরাও, অমুক বস্তু খাওয়াও। ইমাম আহমদ দু'ভগিনীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, তাদের মধ্যে বুদ্ধিমতী কোনটি, তাঁকে উত্তরে বলা হয় ঃ যে বুদ্ধিমতী, তার চোখ নেই। তিনি বললেন ঃ আমি এই অন্ধকেই বিবাহ করব। মোট কথা, যেব্যক্তি আনন্দের জন্যে নয়, বরং প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশে বিবাহ করতে চায়, তার নিয়মনীতি এরূপই হওয়া উচিত, কিন্তু যেব্যক্তি আনন্দ ব্যতীত দ্বীনদারী ঠিক রাখতে পারে না, তার রূপলাবণ্য দেখা উচিত। কারণ, বৈধ বিষয় দ্বারা আনন্দ লাভ করা দ্বীনদারীর একটি দুর্গ। কথিত আছে, সুন্দরী, চরিত্রবতী, কালকেশী আনতনয়না, গৌরবর্ণা ও স্বামী নিবেদিতা স্ত্রী কেউ পেয়ে গেলে সে যেন বেহেশতের হুর পেয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদের পত্নীদেরকে এসব বিশেষণেই বিশেষিত করেছেন। বলা হয়েছে ঃ خَيْرَاتٌ

حِسَانٌ অর্থাৎ, চরিত্রবতী, সুন্দরী। قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ আনতনয়না। عُرُبًا أَتْرَابًا সোহাগিনী ও সমবয়স্কা। حُوْرٌ عِيْنٌ অপ্সরা আয়তলোচনা। বলাবাহুল্য, এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে আনন্দ পূর্ণতা লাভ করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

خير نسائكم من اذا نظر اليها زوجها سرته واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته فى نفسها وما له .

অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সেই উত্তম, যাকে দেখে তার স্বামী আনন্দিত হয়, যে স্বামীর আদেশ পালন করে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের হেফাযত করে এবং স্বামীর ধনসম্পদ দেখাশুনা করে। বলাবাহুল্য, সোহাগিনী স্ত্রীকে দেখেই স্বামী আনন্দিত হয়।

চতুর্থ গুণ হচ্ছে, মোহরানা কম হওয়া। রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, তারাই উত্তম স্ত্রী, যাদের চেহারা-নমুনা ভাল এবং মোহরানা কম। তিনি সীমাতিরিক্ত মোহরানা নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন এবং নিজে কোন কোন বিবাহ দশ দেরহাম ও গৃহের আসবাবপত্রের বিনিময়ে করেছেন। গৃহের আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল একটি আটা পেষার যাঁতা, একটি মাটির কলসী ও একটি নরম গদি। তিনি কোন বিবির বিবাহে যব দ্বারা ওলীমা করেছেন, কোন বিবির ওলীমা খোরমা দ্বারা এবং কোন বিবির ওলীমা ছাতু দ্বারা করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) অধিক মোহরানা ধার্য করতে নিষেধ করে বলতেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও চারশ' দেরহামের অধিক মোহরানার বিনিময়ে বিবাহ করেননি এবং নিজের কন্যাগণের বিবাহেও এর বেশী মোহরানা ধার্য করেননি। যদি অধিক মোহরানা ধার্য করার মধ্যে কোন মাহাত্ম্য থাকত তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সবার আগে তা করতেন। কতিপয় সাহাবী বিবাহে এ পরিমাণ স্বর্ণ মোহরানা হিসাবে ধার্য করেন, যার মূল্য পাঁচ দেরহামের বেশী ছিল না। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রাঃ) আপন কন্যার বিবাহ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সাথে দু'দেরহামের বিনিময়ে দেন। তিনি রাতের বেলায় আপন কন্যাকে নিয়ে তার গৃহের দ্বারে পৌঁছে দিয়ে আসেন এবং সাত দিন পর কন্যার কাছে গিয়ে তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন। সকল ইমামের মাযহাব পালন করার নিয়তে মোহরানা দশ দেরহাম ধার্য করলে কোন ক্ষতি নেই। হাদীসে আছে, স্ত্রী তখন মোবারক হয় যখন তাড়াতাড়ি বিবাহ হয়,

তাড়াতাড়ি সন্তান হয় এবং মোহরানা কম হয়। আরও আছে, সেই স্ত্রীর মধ্যে বরকত বেশী যার মোহরানা সবচেয়ে কম। স্ত্রীর পক্ষ থেকে মোহরানা বেশী হওয়া যেমন মাকরূহ, তেমনি পুরুষের পক্ষ থেকে স্ত্রীর ধন-সম্পদের খবর নেয়াও মাকরূহ। ধনসম্পদের লোভে বিবাহ করা উচিত নয়। সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ যখন কেউ বিবাহ করে এবং জিজ্ঞেস করে, কনের কি কি ধন-সম্পদ আছে, তখন বুঝে নেবে সে চোর। স্বামী কোন উপহার শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করলে এই নিয়ত করবে না যে, এর বদলে সেখান থেকে বেশী পাওয়া যাবে। তদ্রূপ কনের পরিবারের লোকজন কিছু পাঠালেও এরূপ নিয়ত করবে না। বেশী পাওয়ার নিয়ত করা খুবই খারাপ। তবে উপহার পাঠানো মোস্তাহাব ও পারস্পরিক সম্প্রীতির কারণ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ تهادوا وتحابوا (একে অপরকে হাদিয়া পাঠাও এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি কর।) এতে বেশী পেতে চাওয়া আল্লাহ তাআলার এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত ঃ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ অর্থাৎ, অধিক পাওয়ার নিয়তে দিয়ো না। মোট কথা, বিবাহে এ ধরনের কাজ মাকরূহ ও বেদআত। এটা ব্যবসা ও জুয়ার মত এবং এতে বিবাহের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

পঞ্চম গুণ– কনের বন্ধ্যা না হওয়া। যদি বন্ধ্যাত্ব জানা যায়, তবে সেই কনেকে বিবাহ করবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ عليكم بالولود অর্থাৎ, এমন কনেকে বিবাহ করবে, যে সন্তান দেয় এবং স্বামী আসক্তা হয়। সুতরাং কনের পূর্বে বিবাহ না হওয়ার কারণে যদি সে বন্ধ্যা কি না তা জানা না যায়, তবে স্বাস্থ্যবতী ও যুবতী হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করবে। কারণ, এ দু'টি গুণ কনের মধ্যে থাকলে তার সন্তান দেয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

ষষ্ঠ গুণ– কুমারী হওয়া। হযরত জাবের (রাঃ) এক পূর্ব বিবাহিতা মহিলাকে বিবাহ করলে রসূলে করীম (সাঃ) তাকে বলেছিলেন ঃ কুমারী মেয়েকে বিবাহ করলে না কেন, এতে তুমি তার প্রতি এবং সে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকত। স্ত্রী কুমারী হওয়ার উপকারিতা তিনটি ঃ (১) স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি ভালবাসা ও মহব্বত জন্মে। এছাড়া প্রথম পরিচিতজনের সাথে মন লাগে। যে নারী পূর্বে একজন পুরুষের সঙ্গ লাভ করে আসে এবং অবস্থা দেখে-শুনে আসে, পূর্ব পরিচিত বিষয়াদির

বিপরীতে কোন কিছুতে রাজি না হওয়া তার জন্যে বিচিত্র নয়। এটাই দ্বিতীয় স্বামীকে খারাপ মনে করার কারণ হয়ে যেতে পারে। (২) কুমারী স্ত্রীকে স্বামী মহব্বত করে। কেননা, যে নারীকে অন্য কেউ স্পর্শ করে, তার প্রতি স্বামীর মনে স্বভাবগতভাবে ঘৃণা থাকে। মনে এ ধারণা উদয় হতেই স্বামীর মন ভারী হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কোন কোন লোক অত্যধিক আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। (৩) কুমারী হলে স্ত্রী প্রথম স্বামীকে স্মরণ করে না। এ স্মরণও জীবনে এক প্রকার তিক্ততা সৃষ্টি করে। প্রথম প্রিয়জনের প্রতি যে মহব্বত হয়, প্রায়শঃ সেটাই সর্বাধিক পাকাপোক্ত হয়।

সপ্তম গুণ– অভিজাত বংশের অর্থাৎ, দ্বীনদার ও সৎ পরিবারের কনে হওয়া। কেননা, এরূপ পরিবারের মেয়েরা আপন সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষায় মনোযোগী হয়। যে নারী স্বয়ং শিষ্ট ও বিনীত নয়, সন্তানদেরকে সুন্দরভাবে শিষ্ট ও বিনীত করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ اياكم وخضراء الدمن। অর্থাৎ, তোমরা গোবরের স্তূপের শাক-সব্জি থেকে বেঁচে থাক। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ গোবরের স্তূপের শাক-সব্জি কি? তিনি বললেন ঃ সুন্দরী নারী, যে নীচ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। তিনি আরও বলেন ঃ নিজের বীর্যের জন্যে ভাল নারী পছন্দ কর। কেননা, আত্মীয়তার শিরা পিতামাতার চরিত্র সন্তানের মধ্যে টেনে আনে।

অষ্টম গুণ– কনের নিকট সম্পর্কীয়া না হওয়া। এটা কামস্পৃহা হ্রাস করে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ নিকট সম্পর্কীয়া নারীকে বিবাহ করো না, দুর্বল সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। কামস্পৃহা দুর্বল হওয়াই সন্তান দুর্বল হওয়ার কারণ। কেননা, কামস্পৃহা দৃষ্টি ও স্পর্শ শক্তি থেকে উদ্দীপ্ত হয়। নারী নতুন ও অপরিচিতা হলে এই শক্তি জোরদার হয়। যে নারী সর্বদা এক সময় দৃষ্টির সামনে থাকে, তাকে দেখতে দেখতে মানুষ নিস্পৃহ হয়ে যায় এবং পূর্ণ আকর্ষণ থাকে না। ফলে কামস্পৃহাও উদ্দীপ্ত হয় না।

মোট কথা, কনের উপরোক্ত গুণসমূহের কারণে তাকে বিবাহ করার আগ্রহ জন্মায়। বরের স্বভাব-চরিত্র ভালরূপে যাচাই করে নেয়া কনের অভিভাবকেরও কর্তব্য। অভিভাবকের উচিত, কনের প্রতি স্নেহপরবশ হওয়া এবং এমন ব্যক্তির সাথে তাকে বিবাহ না দেয়া, যার দৈহিক গঠনে

কোন ত্রুটি আছে, অথবা যার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয় অথবা যে দ্বীনদারীতে দুর্বল অথবা স্ত্রীর হক আদায়ে অক্ষম অথবা বংশগত দিক দিয়ে কনের সমকক্ষ নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কনেকে বিবাহ দেয়ার মানে তাকে বাঁদী করা। অতএব নিজের কন্যাকে কোথায় দিচ্ছ তা দেখে নাও। কনের জন্যে সাবধানতা অবলম্বন করা খুবই জরুরী। কেননা, বিবাহের কারণে সে এমন বন্দিদশায় পড়ে যা থেকে রেহাই পেতে পারে না। পুরুষ এরূপ নয়। সে সর্বাবস্থায় তালাক দিতে সক্ষম। যখন কোন ব্যক্তি তার কন্যার বিবাহ কোন জালেম, পাপাচারী, বেদআতী অথবা মদখোরের সাথে দেয়, তখন সে নিজের দ্বীনদারীতে কলংক লেপন করে এবং আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের পাত্র হয়। কেননা, সে আত্মীয়তার অধিকার ক্ষুণ্ন করে এরূপ পাত্রের হাতে কন্যাদান করে। এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ কয়েকজন লোক আমার কন্যার জন্যে বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছে। আমি কার সাথে তাকে বিবাহ দেব। তিনি বললেন ঃ তাদের মধ্যে যেব্যক্তি খোদাভীরু, তার সাথে বিবাহ দাও। কেননা, সে তোমার কন্যাকে ভালবাসবে এবং খাতির সমাদর করবে। সে তোমার কন্যাকে অপছন্দ করলেও জুলুম করবে না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি পাপাচারীর হাতে কন্যাদান করে, সে আত্মীয়তা ছিন্ন করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পারস্পরিক জীবন যাপনের আদব

স্বামীর করণীয় আদব ঃ যেসকল আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বামীর জন্যে জরুরী, নিম্নে সেগুলো বিস্তারিত উল্লেখ করা হল।

প্রথম আদব ওলিমা, এটা মোস্তাহাব। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের গায়ে হলুদের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলেন– এটা কি? তিনি আরজ করলেন, আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি এবং খোরমার বীচি পরিমাণ স্বর্ণ মোহরানা সাব্যস্ত করেছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ بارك الله لك اولم ولو بشاة মোবারক হোক। একটি ছাগল দিয়ে হলেও ওলীমা কর। রসূলে করীম (সাঃ) হযরত সফিয়্যাকে বিয়ে করার পর খোরমা ও ছাতু দিয়ে ওলীমা করেন। স্বামীকে মোবারকবাদ দেয়া মোস্তাহাব। যেব্যক্তি তার কাছে আসবে, সে এরূপ বলবে ঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بِخَيْرٍ -

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে মোবারক করুন, তোমার প্রতি বরকত নাযিল করুন এবং তোমাদের মধ্যে পুণ্য কাজে মতৈক্য সৃষ্টি করে দিন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন– فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে দফ বাজানো ও হৈচৈ করা। আরও বলা হয়েছে–

اعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف -

এ বিবাহ ঘোষণা কর, একে মসজিদে সম্পন্ন কর এবং এর জন্যে দফ্ বাজাও।

রবী বিনতে মোয়াওভেয রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার কাছে বাসর রাত্রির ভোরে এসে আমার শয্যায় বসে গেলেন। আমাদের কয়েকজন বালিকা দফ বাজাচ্ছিল এবং বদর যুদ্ধে আমার পরিবারের

নিহত ব্যক্তিদের কীর্তিগাথা আবৃত্তি করছিল। তাদের একজন এমনও বলে ফেলল, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন, যিনি আগামীকাল যা ঘটবে তা জানেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে একথা বলতে বারণ করে বললেন ঃ পূর্বে যা বলছিলে, তাই বল।

দ্বিতীয় আদব স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করা এবং দয়াপরবশ হয়ে তাদের নিপীড়ন সহ্য করা। কেননা, তাদের জ্ঞানবুদ্ধি অপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ, মহিলাদের সঙ্গে সদাচরণ সহকারে জীবন যাপন কর। ওফাতের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওসিয়ত ছিল তিনটি বিষয়। সেগুলো বলতে বলতেই তাঁর কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল। তিনি বলছিলেন "

الصلوة الصلوة وما ملكت ايمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون الله الله فى النساء انهن عوان فى ايديكم اخذتموهن بعهد الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله -

অর্থাৎ, নামায কায়েম কর, নামায কায়েম কর। তোমরা যেসকল গোলাম ও বাঁদীর মালিক, তাদেরকে তাদের সাধ্যাতীত কাজ করতে বলো না। স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তারা তোমাদের হাতে বন্দী। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারের মাধ্যমে গ্রহণ করেছ এবং তাদের লজ্জাস্থান আল্লাহর কলেমা উচ্চারণ করে হালাল করেছ।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে- যেব্যক্তি তার স্ত্রীর অসদাচরণে সবর করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এই পরিমাণ সওয়াব দেবেন, যে পরিমাণ হযরত আইউব (আঃ)-কে তাঁর বিপদের কারণে দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে যে স্ত্রী তার স্বামীর বদমেযাজীতে সবর করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ফেরাউন-পত্নী আছিয়ার সমান সওয়াব দান করবেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা দরকার, স্ত্রীর সাথে সদাচরণের অর্থ স্ত্রী পীড়ন না করলে সদাচরণ করা নয়; বরং অর্থ হচ্ছে, স্ত্রীর পীড়নের জওয়াবে সদাচরণ করা। স্ত্রী রাগ করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণে তার রাগ সহ্য করা। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবিগণও তাঁর সামনে রাগ করতেন এবং তাঁদের কেউ কেউ সারাদিন তাঁর সাথে কথা বলতেন না। তিনি এসব বিষয় নীরবে সহ্য করতেন এবং তাঁদের সাথে কঠোর ব্যবহার করতেন না। হযরত ওমর

(রাঃ)-এর পত্নী একবার তাঁর কথার জওয়াব দিলে তিনি রাগতস্বরে বললেন ঃ হে উদ্ধত, তুমি আমার কথার জওয়াব দিচ্ছ। পত্নী বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবিগণও তাঁর কথার জওয়াব দেন। অথচ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। হযরত ওমর বললেন ঃ হাফসা জওয়াব দিয়ে থাকলে সে খুব খারাপ করেছে। অতঃপর তিনি কন্যা হাফসাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে হাফসা, সিদ্দীকের কন্যা হবার লোভ করো না। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদরিণী। তুমি কখনও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথার জওয়াব দেবে না।

বর্ণিত আছে, পবিত্র বিবিগণের একজন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বুকে হাত রেখে তাঁকে ধাক্কা দেন। এ জন্যে তাঁর মা তাঁকে শাসালে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ ছাড়, তাকে কিছু বলো না। এই পত্নীরা তো এর চেয়ে বড় কান্ডও করে! একবার রসূলে করীম (সাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হলে তাঁরা উভয়েই হযরত আবু বকরের কাছে বিচারপ্রার্থী হন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আয়েশাকে বললেন ঃ তুমি আগে বলবে, না আমি বলব। হযরত আয়েশা আরজ করলেন ঃ আপনি বলুন, কিন্তু সত্য সত্য বলবেন। একথা শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) কন্যা আয়েশাকে সজোরে এক চপেটাঘাত করে বললেন ঃ তুই কি বলছিস, হযরত কি সত্য ছাড়া মিথ্যা বলতে পারেন। হযরত আয়েশা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আশ্রয় চাইলেন এবং তাঁর পেছনে গিয়ে লুকালেন। রসূলে করীম (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বললেন ঃ আমরা তোমাকে এজন্যে ডাকিনি এবং তুমি এরূপ করবে এটাও আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। একবার কোন এক কথায় রাগান্বিত হয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, আপনিই বলেন, আপনি পয়গম্বর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুচকি হেসে তা সহ্য করে নিলেন। রসূলে আকরাম (সাঃ) হযরত আয়েশাকে বলতেন ঃ আয়েশা, আমি তোমার রাগ ও সন্তুষ্টি বুঝে নিতে পারি। তিনি আরজ করলেন ঃ আপনি তা কেমন করে বুঝতে পারেন? তিনি বললেন ঃ যখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক, তখন কসম খেতে গিয়ে বল– মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আল্লাহর কসম, আর রাগের অবস্থায় বল– ইবরাহীম (আঃ)-এর আল্লাহর কসম। হযরত আয়েশা আরজ করলেন ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি কেবল আপনার নামটিই বর্জন করি।

কথিত আছে, ইসলামে সর্বপ্রথম যে প্রেম হয়, তা ছিল রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ-এর মধ্যকার প্রেম। তিনি হযরত আয়েশাকে বলতেন ঃ আমি তোমার সাথে এমন যেমন আবু সূরা তার স্ত্রী উম্মে সূরার সাথে ছিল, কিন্তু আমি তোমাকে তালাক দিব না। (শামায়েলে তিরমিযীতে বর্ণিত উম্মে সূরার হাদীসটি সুবিদিত। তা একদিন এগার জন মহিলা হযরত আয়েশার কাছে সমবেত হয়ে নিজ নিজ স্বামীর অবস্থা বর্ণনা করল। এই এগার জনের মধ্যে উম্মে সরাও ছিল। তার স্বামী তার সাথে অনেক সদ্ব্যবহার করেছিল এবং অবশেষে তালাক দিয়েছিল। হযরত আয়েশা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এই মহিলাদের বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে একথা বলেছিলেন।) রসূলুল্লাহ (সাঃ) পত্নীদেরকে বলতেন ঃ তোমরা আয়েশার ব্যাপারে আমাকে পীড়ন করো না। আল্লাহর কসম, আমার কাছে যখন ওহী আসে, তখন আমি তার লেপের নীচে থাকি। (অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কারও কাছে এরূপ হয়নি।) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নারী ও শিশুদের প্রতি সবার তুলনায় অধিক দয়াশীল ছিলেন।

তৃতীয় আদব, পীড়ন সহ্য করা সত্ত্বেও স্ত্রীদের সাথে হাসি তামাশা ও আনন্দ করবে। এতে তাদের মন প্রফুল্ল হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নিয়ম ছিল, তিনি বিবিগণের সাথে ব্যঙ্গ-কৌতুক করতেন এবং কাজে ও চরিত্রে তাদের স্তরে নেমে যেতেন। এমন কি বর্ণিত আছে, তিনি হযরত আয়েশার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতাও করেছেন। একদিন হযরত আয়েশা দৌড়ে জিতে গেলেন। এর পর একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দৌড়ে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ আয়েশা! (রাঃ) এটা সেদিনের প্রতিশোধ। হাদীসে আছে, অন্য সব মানুষের তুলনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিবিগণের সাথে অধিক আনন্দ করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ একদিন আমি আবিসিনিয়ার লোকদের আওয়ায শুনলাম। তারা আশুরার দিন খেলাধুলা করছিল। রসূলে করীম (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ তুমি কি তাদের খেলা দেখতে চাও। আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি খেলোয়াড়দেরকে ডাকলেন। তারা হাযির হলে তিনি দরজার উভয় কপাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নিজের হাত কপাটের উপরে ছড়িয়ে দিলেন। আমি আমার চিবুক তাঁর হাতের উপর রেখে খেলা দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর রসূলুল্লাহ্

(সাঃ) বললেন ঃ আয়েশা, আর কত। আমি দুই কিংবা তিন বার বললামঃ আর একটু রাখুন। অতঃপর তিনি এরশাদ করলেন ঃ আয়েশা, আর না। এবার শেষ কর। আমি, বললাম ঠিক আছে, চলুন । তার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খেলোয়াড়দেরকে ইশারা করলে তারা চলে গেল। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله

মুমিনদের মধ্যে অধিক কামেল মুমিন সে ব্যক্তি, যার অভ্যাস ভাল এবং সে পরিবার পরিজনের প্রতি অধিক কৃপাশীল। এক হাদীসে আছে- خيركم خيركم لنسائه وانا خيركم لنسائي তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীদের জন্যে সর্বোত্তম । আমি আমার স্ত্রীদের জন্যে তোমাদের চাইতে উত্তম।

হযরত ওমর (রাঃ) কঠোর চিত্ত হওয়া সত্ত্বেও বলেন ঃ পুরুষের উচিত নিজের ঘরে শিশুদের মত থাকা। যখন তার কাছে কোন জিনিস চাওয়া হয় তখন পুরুষ হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত জাবেরকে বলেছিলেন, – কুমারী নারীকে বিবাহ করলে না কেন, যাতে তুমি তার সাথে কৌতুক করতে এবং সে তোমার সাথে আনন্দ করতো।

চতুর্থ আদব, স্ত্রীর চাহিদার এত বেশী অনুসরণ করবে না যাতে তার মেযাজ বিগড়ে যায় এবং তার সামনে নিজের কোন ভয়ভীতি না থাকে বরং এতে সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। খারাপ কিছু দেখলে তাতে কখনও সম্মত হবে না। স্ত্রী শরীয়ত অথবা ভদ্রতা বিরোধী কোন কিছু করলে তৎক্ষণাৎ ক্রোধ প্রকাশ করবে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি স্ত্রৈণ অর্থাৎ, স্ত্রী যা চায় তাই করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উপুড় করে দোযখে ফেলে দেবেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, স্ত্রীদের মর্জির বিপরীত কাজ কর, এতে বরকত হয়। তিনি আরও বলেন ঃ স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ কর এবং তারা যে পরামর্শ দেয় তার বিপরীত কর। হাদীসে আছে- স্ত্রীর গোলাম ধ্বংস হোক। এর কারণে, স্ত্রীর খাহেশের বিষয়াদিতে তার আনুগত্য করলে তার গোলামী করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে স্ত্রীর মালিক করেছেন, কিন্তু সে নিজেকে তার গোলাম করে দিয়েছে। ফলে ব্যাপার উল্টে গেছে। সে কোরআনে বর্ণিত শয়তানের এই উক্তিরও আনুগত্য করেছে- وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ -

অর্থাৎ, আমি মানুষকে আদেশ করব, তারা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পাল্টে দিক। পুরুষের হক ছিল অনসৃত হওয়ার- অনুসারী হওয়ার নয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষদেরকে নারীদের উপর শাসক সাব্যস্ত করেছেন। যেমন বলা হয়েছে-

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ অর্থাৎ, পুরুষরা স্ত্রীদের উপর শাসক। সুতরাং স্ত্রীদের লাগাম সামান্য শিথিল করে দিলে তারা পুরুষদেরকে কয়েক হাত হেঁচড়ে নিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে লাগাম টেনে রাখলে এবং জায়গা মত কঠোর হলে স্ত্রীরা আয়ত্তে থাকবে। ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ তিনটি বস্তু এমন রয়েছে, তুমি তাদের সম্মান করলে তারা তোমাকে অপদস্থ করবে এবং তুমি অপদস্থ করলে তারা তোমান সম্মান করবে। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে স্ত্রী , দ্বিতীয়টি খাদেম এবং তৃতীয়টি নিবর্তী। ইমাম শাফেয়ীর উদ্দেশ্য, যদি কেবল সন্মান কর এবং মাঝে মাঝে নরমের সাথে সাথে শক্ত না হও, শক্ত কথা না বল, তবে নিঃসন্দেহে মাথায় চড়ে বসবে। মোট কথা, আকাশ ও পৃথিবী সমতা এবং মধ্যবর্তিতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। মধ্যবর্তিতা থেকে সামান্য বিচ্যুত হলে ব্যাপার উল্টে যায়। তাই বুদ্ধিমানের উচিত হল স্ত্রীর সাথে আনুকূল্য ও বিরোধিতায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং প্রত্যেক ব্যাপারে সত্যের অনুসরণ করা, যাতে তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায়। কেননা, স্ত্রীদের কলাকৌশল অত্যন্ত মন্দ এবং তাদের অনিষ্ট প্রকাশ্য। তাদের মানসিকতায় অসদাচরণ ও জ্ঞানবুদ্ধির স্বল্পতা প্রবল। এতে সমতা তখনই আসবে, যখন নরম ও শক্ত উভয় প্রকার ব্যবহার তাদের সাথে করা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তিনটি বিপদ থেকে আশ্রয় চাইবে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে দুশ্চরিত্রা নারী । সে বার্ধক্যের পূর্বেই বৃদ্ধ করে দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিবিগণ ছিলেন মহিলাদের মধ্যে সর্বোত্তম । তাঁদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ انتن صواحبات يوسف তোমরা ইউসুফ (আঃ)-এর সহচরী। (রসূলুল্লাহ্ [সাঃ] ওফাতের পূর্বে যখন রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন এবং নামায পড়ানোর শক্তি তাঁর ছিল না, তখন এরশাদ করেন ঃ আবু বকরকে নামায পড়াতে বল। এতে হযরত আয়েশা আপত্তি করে বলেন ঃ আমার পিতা কোমলচিত্ত। মানুষ আপনার স্থান শূন্য দেখে তিনি স্থির থাকতে পারবেন না। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উপরোক্ত বাক্য

উচ্চারণ করেন। অর্থাৎ, তুমি যে আবু বকরকে নামায পড়াতে নিষেধ করছ, এটা সত্য পরিহার করে খেয়াল-খুশীর দিকে ঝুঁকে পড়ার শামিল।) এক হাদীসে আছে–

لايفلح قوم تملكهم امراة -

অর্থাৎ, যে সম্প্রদায়ের মালিক নারী, তার কল্যাণ হবে না।

পঞ্চম আদব, স্ত্রীদের প্রতি কুধারণায় তাদের গোপন বিষয়ের অনুসন্ধানে বাড়াবাড়ি করবে না। রসূলে করীম (সাঃ) স্ত্রীদের গোপন বিষয়সমূহের পেছনে পড়তে বারণ করেছেন। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি স্ত্রীদের সামনে হঠাৎ উপস্থিত হতে বারণ করেছেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনায় প্রবেশের পূর্বে বললেন ঃ রাতের বেলায় স্ত্রীদের কাছে যাবে না। এই আদেশ উপেক্ষা করে দুই ব্যক্তি বাড়ি গিয়ে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি দেখতে পেল। প্রসিদ্ধ এক হাদীসে আছে–

المراة كالضلع ان قومته كسرته فدعه تستمتع به على عوج

অর্থাৎ, নারী পাঁজরের অস্থির ন্যায় বাঁকা। একে সোজা করতে চাইলে ভেঙ্গে যাবে। অতএব বাঁকা অবস্থায়ই এর দ্বারা উপকৃত হও। নারী চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশে এ কথাটি বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলছেন ঃ

ان من الغيرة يبغضها الله عزوجل وهى غيرة الاهل على اهله من غير ريبة -

অর্থাৎ, কোন কোন আত্মসম্মানবোধ আল্লাহ্ তা'আলা অপছন্দ করেন। তাহল স্ত্রীর উপর পুরুষের আত্মসম্মানবোধ, যা কোন সন্দেহ ছাড়াই হয়। কেননা, এরূপ আত্মসম্মনবোধের উৎস হচ্ছে কুধারণা, যা করা নিষিদ্ধ। আত্মসম্মানবোধ যথাস্থানে প্রশংসনীয়। মানুষের মধ্যে তা অবশ্যই থাকা উচিত। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর আত্মসম্মানবোধ রয়েছে। মুমিনের আত্মসম্মানবোধ রয়েছে। মানুষের উপর আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা আল্লাহর আত্মসম্মানবোধ। তিনি আরও বলেন ঃ সা'দের আত্মসম্মান দিয়ে তোমরা কি কর? আল্লাহর কসম, আমি সা'দের তুলনায়

অধিক আত্মসম্মানের অধিকারী। আল্লাহ্ তাআলা আমার চেয়ে অধিক আত্মসম্মান রাখেন। এই আত্মসম্মানের কারণেই তিনি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পাপাচার হারাম করেছেন। আল্লাহ তাআলার তুলনায় অন্য কারও আপত্তি করা অধিক পছন্দনীয় নয়। এ কারণেই তিনি সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা রসূল প্রেরণ করেছেন। তারীফও তাঁর চেয়ে অধিক অন্য কেউ পছন্দ করে না। এ কারণেই তিনি জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমি মেরাজ রজনীতে জান্নাতের ভেতরে একটি প্রাসাদ দেখেছি। তার আঙ্গিনায় একটি বাঁদী ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই প্রাসাদ কার। কেউ জওয়াব দিল ঃ ওমরের। আমি তার অভ্যন্তরভাগ দেখতে চাইলাম, কিন্তু হে ওমর, তোমার আত্মসম্মানবোধের কথা মনে পড়ে গেল। হযরত ওমর কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ আমি কি আপনাকে আত্মসম্মানবোধ দেখাব? হযরত হাসান বসরী বলতেন ঃ কাফেরদের গা ঘেঁষে চলার জন্যে তোমরা স্ত্রীদেরকে বাজারে পাঠিয়ে দাও! যার আত্মসম্মানবোধ নেই, সে ধ্বংস হোক।

আত্মসম্মানবোধের প্রয়োজন তখন হয় না, যখন স্ত্রীর কাছে বেগানা পুরুষ আসে না এবং স্ত্রী বাজারে বের হয় না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ নারীর জন্যে উত্তম কি, তিনি বললেন ঃ উত্তম, সে বেগানা পুরুষকে দেখবে না এবং কোন বেগানা পুরুষও তাকে দেখবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ এমন জওয়াব দেবে না কেন, কেমন বাপের মেয়ে! সাহাবায়ে কেরাম প্রাচীরের ছিদ্র বন্ধ করে দিতেন, যাতে মহিলারা পুরুষদেরকে না দেখে। হযরত মুয়ায (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে আলো আসার ছিদ্র দিয়ে বাইরে তাকাতে দেখে শাস্তি দিয়েছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন ঃ স্ত্রীদেরকে উৎকৃষ্ট পোশাক দিয়ো না, তা হলে গৃহ মধ্যে থাকবে। কারণ এই, মহিলারা ছন্নছাড়া অবস্থায় বাইরে যাওয়া পছন্দ করে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মহিলার গৃহ মধ্যে থাকার অভ্যাস গড়ে তুলুক। তিনি শুরুতে মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। বর্তমানে বৃদ্ধাদের ছাড়া অন্যদের জন্যে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি না থাকা উত্তম। বরং এটা সাহাবায়ে কেরামের আমলেও সঙ্গত ছিল না। তাই হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর মহিলারা যেসব বিষয় উদ্ভাবন করেছে, তা যদি তিনি জানতেন তবে তাদেরকে বাইরে যেতে

অবশ্যই নিষেধ করতেন। একবার হযরত ইবনে ওমর এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন– لاتمنعوا اماء الله مساجد الله অর্থাৎ, আল্লাহ্র বাঁদীদেরকে অর্থাৎ, মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে বারণ করো না। তখন তাঁর পুত্র বলে উঠল ঃ আল্লাহর কসম, আমরা বারণ করব। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ পুত্রকে প্রহার করলেন এবং ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন ঃ আমি বলি রসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন বলেন। আর তুই কিনা তা অমান্য করছিস। এর অর্থ কি, তাঁর পুত্রের এই বিরোধিতার কারণ ছিল, পরিবর্তিত অবস্থা তাঁর জানা ছিল। ইবনে ওমরের ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ, বাহ্যতঃ কোন কারণ বর্ণনা না করেই পুত্র হাদীসের বিপরীত উক্তি করেছিল। অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাদেরকে বিশেষভাবে ঈদের নামাযে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন, তাও স্বামীদের অনুমতি দেয়ার শর্ত সাপেক্ষে। বর্তমান যুগেও সতী-সাধ্বী নারীদের স্বামীর অনুমতিক্রমে বাইরে যাওয়া জায়েয, কিন্তু না যাওয়াতেই সাবধানতা বেশী। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া মহিলাদের বাইরে যাওয়া উচিত নয়। তামাশা ও অনাবশ্যক কাজের জন্যে মহিলাদের বাইরে যাওয়া সাধারণ ভদ্রতারও পরিপন্থী। এতে মাঝে মাঝে অনর্থও সৃষ্টি হয়। এর পর বাইরে গেলে পুরুষদের দিক থেকে দৃষ্টি নত রাখবে। আমরা বলি না, নারীর মুখমণ্ডলও নারীর জন্যে গোপনীয়, বরং ফেতনার অবস্থায় পুরুষের মুখমণ্ডল দেখা হারাম। ফেতনার ভয় না থাকলে হারাম নয়। কেননা, পূর্ববর্তী যুগে পুরষরা সর্বদাই খোলামেলা চলাফেরা করেছে এবং মহিলারা অবগুণ্ঠন লাগিয়ে বের হয়েছে। পুরুষদের মুখমণ্ডল মহিলাদের জন্যে গোপনীয় হলে পুরুষদেরকেও অবগুণ্ঠন ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হত।

ষষ্ঠ আদব, স্ত্রীদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহনে সমতা বজায় রাখবে। অর্থাৎ, এতে সংকীর্ণতাও অবলম্বন করবে না এবং অপব্যয়ও করবে না, বরং মধ্যম পর্যায়ে খরচপত্র দেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا তোমরা খাও, পান কর এবং অপব্যয় করো না। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– وَلَاتَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ অর্থাৎ, হাতকে ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখো না এবং পুরোপুরি খুলতে দিয়ো না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ خيركم خيركم لاهله তোমাদের মধ্যে সে লোক উত্তম, যে তার পরিবার-পরিজনের

জন্যে উত্তম। অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ এক দীনার তুমি জেহাদে ব্যয় করবে, এক দীনার গোলাম মুক্ত করার কাজে ব্যয় করবে, এক দীনার কোন মিসকীনকে সদকা দেবে এবং এক দীনার পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করবে। এগুলোর মধ্যে অধিক সওয়াব সে দীনারের হবে, যা তুমি পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করবে। কথিত আছে, হযরত আলী (রাঃ)-এর চার কন্যা ছিলেন। তিনি তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে প্রতি চার দিনে এক দেরহাম গোশত ক্রয় করতে দিতেন।

নিজে উৎকৃষ্ট খাদ্য খাবে এবং পরিজনকে তা থেকে খাওয়াবে না, গৃহকর্তার জন্যে এটা সমীচীন নয়, এটা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। যদি গৃহকর্তার এরূপ একা খাওয়াই কাম্য হয়, তবে গোপনে খাওয়া উচিত। অন্যদের সামনে এরূপ খাদ্যের আলোচনা করাও উচিত নয়, যা তাদেরকে খাওয়ানো উদ্দেশ্য নয়। যখন খেতে বসবে, তখন ঘরের সকলকে সঙ্গে নিয়ে বসবে। হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ সে ঘরের লোকজনের প্রতি রহমত প্রেরণ করেন, যারা একত্রে বসে আহার করে।

সপ্তম আদব, পুরুষের পক্ষে হায়েযের বিধানাবলী শেখা উচিত, যাতে এ দিনগুলোতে কি কি বিষয় থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব, তা জানা যায়। স্ত্রীকেও শিক্ষা দেয়া দরকার, হায়েযের সময়কার কোন্ কোন্ নামাযের কাযা পড়তে হবে এবং কোন্ কোন্ নামাযের কাযা পড়তে হবে না। কেননা, কোরআন শরীফে স্ত্রীকে দোযখ থেকে বাঁচানোর জন্যে পুরুষদের প্রতি এই বলে নির্দেশ রয়েছে, قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا (নিজেদেরকে এবং পরিবার পরিজনকে দোযখ থেকে রক্ষা কর।) অতএব স্ত্রীকে আহলে সুন্নতের বিশ্বাসসমূহ শিক্ষা দেয়া পুরুষের জন্যে অপরিহার্য। যদি স্ত্রী বেদআতে কান দিয়ে থাকে, তবে তা তার মন থেকে দূর করবে। দ্বীনদারীর ব্যাপারে অলসতা করলে তাকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাবে এবং হায়েয ও এস্তেহাযার প্রয়োজনীয় মাসআলা বলে দেবে। মাসআলা শেখার জন্যে স্বামী যথেষ্ট হলে এর জন্য কোন আলেমের কাছে যাওয়া স্ত্রীর জন্যে বৈধ নয়। পুরুষ স্বল্প জ্ঞান হলেও যদি কোন মুফতীর কাছ থেকে স্ত্রীর প্রশ্নের জওয়াব এনে দিতে পারে, তবুও তার জন্যে বাইরে

যাওয়া জায়েয নয়। অন্যথায় স্ত্রীর বাইরে যাওয়া এবং জিজ্ঞেস করে নেয়া জায়েয; বরং ওয়াজিব। এমতাবস্থায় স্বামী নিষেধ করলে গোনাহগার হবে। যদি স্ত্রী ফরযগুলো শিখে নেয়, তবে অধিক শিক্ষার জন্যে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ওয়াজের মসলিসে যাওয়া জায়েয নয়। স্ত্রী হায়েয এস্তেহাযার কোন বিধান না জানার কারণে পালন করে না এবং স্বামীও শিক্ষা দেয় না, এমতাবস্থায় স্বামী স্ত্রীর সাথে যাবে। নতুবা গোনাহে তার অংশীদার হবে।

অষ্টম আদব, একাধিক স্ত্রী থাকলে স্বামী তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত সমতা প্রতিষ্ঠা করবে এবং কারও দিকে বেশী ঝুঁকে পড়বে না। যদি সফরে একজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় তবে লটারিযোগে নির্ধারণ করবে। লটারিতে যার নাম আসে, তাকেই সাথে নিয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরূপ করতেন। কোন স্ত্রীর পালা বাদ পড়লে তার কাযা করবে। এটা ওয়াজিব। বেশী স্ত্রী থাকলে ন্যায়বিচারের বিধানাবলী জেনে নেয়া দরকার। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من كان له امراتان فمال الى احدهما دون الاخرى جاء يوم القيامة واحد شقيه مائل ـ

অর্থাৎ, যার দু'স্ত্রী থাকে, অতঃপর সে একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, সে কেয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার এক পার্শ্ব ঝুঁকে থাকবে।

বলাবাহুল্য, স্বামীর উপর কেবল খরচ দেয়া ও শয়ন করার মধ্যে ন্যায়বিচার করা ওয়াজিব– ভালবাসা ও সহবাসে ওয়াজিব নয়। কেননা, এটা মানুষের এখতিয়ার বহির্ভূত ব্যাপার। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْآ اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ অর্থাৎ, আন্তরিক মহব্বতে ন্যায়বিচার করতে তোমরা কস্মিনকালেও সক্ষম হবে না। এটা তোমাদের সাধ্যের বাইরে। যদিও তোমরা এটা করতে আগ্রহী হও। সহবাসও আন্তরিক মহব্বতের অনুগামী। রসূলে করীম (সাঃ) বিবিগণকে খরচপত্র দেয়া ও রাতে সঙ্গে থাকার ব্যাপারে ন্যায়বিচার করতেন এবং বলতেন ঃ ইলাহী, যে বিষয় আমার আয়ত্তে তাতে আমি এই চেষ্টা করেছি। এখন যে বিষয়ের মালিক আপনি এবং যা আমার আয়ত্তাধীন

নয়, তাতে ন্যায়বিচার করার সাধ্য আমার নেই। অর্থাৎ, আন্তরিক ভালবাসা আমার ইচ্ছাধীন নয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) সব বিবির তুলনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অধিক প্রিয় ছিলেন। সবাই একথা জানতেন। শেষ রোগশয্যায় তাঁর খাট প্রত্যহ সেই বিবির গৃহে পৌঁছে দেয়া হত, যার পালা থাকত। তিনি রাতে সেখানে থাকতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, সকালে আমি কোথায় থাকব? এতে একজন বিবি বুঝে নিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য হযরত আয়েশার পালার দিন জিজ্ঞেস করা। এর পর সকল বিবি মিলে আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমরা আপনাকে অনুমতি দিলাম, আপনি আয়েশার ঘরেই থাকুন। প্রতি রাতে আপনাকে এক এক জায়গায় পৌঁছানোর কারণে আপনার কষ্ট হয়। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি সবই এতে রাজি? বিবিগণ বললেন ঃ হাঁ, আমরা সবাই রাজি। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে আয়েশার গৃহে নিয়ে চল। কোন স্ত্রী নিজের পালা অন্য স্ত্রীকে দান করে দিলে এবং স্বামীও তাতে সম্মত থাকলে অন্যের হক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত সওদাকে বয়োবৃদ্ধ হওয়ার কারণে তালাক দিতে ইচ্ছা করলে তিনি নিজের পালা হযরত আয়েশাকে দিয়ে দেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আবেদন করেন ঃ আমাকে তালাক দেবেন না, যাতে কেয়ামতে আপনার বিবিগণের দলে আমার হাশর হয়। তাঁর এই আবেদন গৃহীত হয় এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জন্যে কোন পালা নির্দিষ্ট করতেন না; বরং হযরত আয়েশার পালা হত দু'রাত এবং অন্যদের এক এক রাত।

নবম আদব, যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ হয় এবং বনিবনার কোন উপায় অবশিষ্ট না থাকে, তবে স্বামীর পরিবারের একজন ও স্ত্রীর পরিবারের একজন– এই দুই জন সালিস বসবে। উভয় সালিস তাদের অবস্থা দেখবে। যদি তারা পুনর্মিলন চায়, তবে পুনর্মিলন করিয়ে দেবে। হযরত ওমর (রাঃ) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আপোষ করানোর জন্যে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। সে আপোষ না করিয়ে ফিরে এলে তিনি তাকে শাসিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেছেন– اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا। স্বামী-স্ত্রী সংশোধন চাইলে আল্লাহ তাআলা উভয়ের মধ্যে বনিবনা সৃষ্টি করে দেবেন। অথচ তুমি আপোষ না করিয়েই ফিরে এলে? লোকটি পুনরায় গেল এবং নিয়ত ঠিক করে স্বামী-স্ত্রীর সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলল। ফলে পুনর্মিলন সক্ষম হয়ে গেল। এটা তখন, যখন

উভয়ের পক্ষ থেকে কিংবা স্বামীর পক্ষ থেকে অবাধ্যতা হয়। আর যদি বিশেষভাবে স্ত্রীর পক্ষ থেকে অবাধ্যতা হয়, তবে স্বামী স্ত্রীর উপর প্রবল বিধায় তার উচিত শাসন করা এবং বল প্রয়োগে স্ত্রীকে বাধ্য করা। অনুরূপভাবে যদি স্ত্রী নামায না পড়ে, তবে স্বামী জবরদস্তি তাকে নামায পড়াবে, কিন্তু শাসনে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। তা হচ্ছে, প্রথম উপদেশ দেবে এবং আখেরাতের আযাব ও নিজের শাস্তির বিষয়ে সতর্ক করবে। এটা উপকারী না হলে শয্যায় স্ত্রীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে শয়ন করবে অথবা একই ঘরে থেকে নিজের বিছানা আলাদা করে নেবে। তিন রাত পর্যন্ত তাই করবে। যদি তাও কার্যকর না হয়, তবে স্ত্রীকে এমনভাবে মারধর করবে, যাতে কষ্ট তো হয়, কিন্তু জখম হবে না এবং হাড্ডি ভাঙ্গবে না। মুখে মারবে না। এটা নিষিদ্ধ! জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ স্ত্রীর হক কি? তিনি বললেন ঃ যখন স্বামী খাবে, স্ত্রীকে খাওয়াবে এবং যখন নিজে পরবে, তখন স্ত্রীকে পরাবে। যদি মারার প্রয়োজন হয় তবে নির্মমভাবে মারবে না। আলাদা শয়ন করলে একই ঘরে শয়ন করবে। স্ত্রীর কোন দ্বীনদারীর ব্যাপারে রাগ করলে দশ-বিশ দিন অথবা এক মাস পর্যন্ত স্ত্রীর কাছে শয়ন বর্জন করা স্বামীর জন্যে জায়েয। রসূলুল্লাহ (সাঃ)ও এমন করেছেন। একবার উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব (রাঃ)-এর কাছে তিনি কিছু উপহার প্রেরণ করেন। হযরত যয়নব তা ফেরত পাঠিয়ে দেন। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে বিবির ঘরেই তশরীফ রাখতেন, তিনিই আরজ করতেন ঃ যয়নব আপনার কদর করেনি। আপনার দেয়া উপহার সে প্রত্যাখ্যান করেছে। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সকল বিবিকে সতর্কবাণী শুনিয়ে পূর্ণ একমাস তাঁদের সাথে রাগ করে রইলেন। এর পর তাঁদের কাছে গেলেন।

দশম আদব হচ্ছে সহবাস সংক্রান্ত আদব। সহবাসে মোস্তাহাব হচ্ছে বিসমিল্লাহ বলে সূরা এখলাস পাঠ করবে এবং আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে এই দোয়া করবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا ذُرِّيَّةً اِنْ كُنْتَ قَدَّرْتَ اَنْ تَخْرُجَ ذٰلِكَ مِنْ صُلْبِىْ -

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তখন এই দোয়া পড়বে–

اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَتٰى اَهْلَهٗ قَالَ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِى الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ -

অর্থাৎ, আল্লাহ, আমাকে আলাদা রাখ শয়তান থেকে এবং শয়তানকে আলাদা রাখ তোমার দেয়া সন্তান থেকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন সন্তান জন্ম নিলে এই দোয়ার বরকতে শয়তান তার কোন ক্ষতি করবে না। এর পর বীর্যস্খলনের সময় নিকটবর্তী হলে ঠোঁট না নাড়িয়ে মনে মনে এই দোয়া পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا وَّجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا -

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বীর্য দ্বারা মানব সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে আত্মীয় ও বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। সহবাসের সময় নিজেকে এবং স্ত্রীকে কোন বস্তু দ্বারা আবৃত করে নেয়া উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের মস্তক ঢেকে নিতেন এবং বিবিকে বলতেন ঃ গাম্ভীর্য সহকারে থাক। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন স্বামী-স্ত্রী সহবাস করতে চায়, তখন যেন গাধার মত উলঙ্গ না হয়। সহবাসের পূর্বে প্রেমালাপ ও চুম্বন করা উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন স্ত্রীর উপর চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় পতিত না হয়; বরং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রথমে দূত বিনিময় হওয়া উচিত। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! দূত বিনিময় কি? তিনি বললেন ঃ চুম্বন ও প্রেমালাপ। অন্য এক হাদীসে আছে– তিনটি বিষয় পুরুষের অক্ষমতার পরিচায়ক। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আলাপ না করে, প্রীতি সৃষ্টি না করে, কাছে শয়ন না করেই স্ত্রী অথবা বাঁদীর সাথে সহবাস শুরু করা এবং নিজের প্রয়োজন সেরে নেয়া ও স্ত্রীর প্রয়োজন অপূর্ণ রেখে দেয়া।

তিন রাতে সহবাস করা মাকরূহ– মাসের প্রথম ও শেষ রাতে এবং পনর তারিখের রাতে। কোন কোন আলেম জুমুআর দিন ও জুমুআর রাতে সহবাস করা মোস্তাহাব বলেছেন। পুরুষের বীর্যস্খলন হলে কিছুক্ষণ এমনিভাবে থেমে থাকবে, যাতে স্ত্রীর প্রয়োজনও পূর্ণ হয়ে যায়। কেননা, মাঝে মাঝে স্ত্রীর বীর্যস্খলন বিলম্বে হয়। তখন পুরুষের সরে যাওয়া তার পীড়ার কারণ হয়। একযোগে বীর্যস্খলন হওয়াকে স্ত্রী ভাল মনে করে। স্বামীর উচিত প্রতি চার দিনে একবার সহবাস করা। অবশ্য এর চেয়ে

বেশী কমও হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে স্ত্রীর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা স্ত্রীকে সতী পুণ্যবতী রাখা স্বামীর উপর ওয়াজিব। হায়েযের দিনগুলোতে এবং পরে গোসল করার পূর্বে সহবাস করবে না। কোরআন পাকে এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কথিত আছে, এতে সন্তান কুষ্ঠগ্রস্ত হয়। হায়েযের দিনগুলোতে সহবাস ছাড়া স্ত্রীর সমগ্র শরীর ভোগ করা জায়েয। পেছনের দিক অর্থাৎ, মলদ্বার দিয়ে সহবাস করা নাজায়েয। কেননা, হায়েযওয়ালী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা নোংরামির কারণে হারাম। মলদ্বারে সহবাস করলে সর্বাবস্থায় নোংরামি হয়ে থাকে। সুতরাং এর নিষেধাজ্ঞা ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসের নিষেধাজ্ঞার চেয়ে অধিকতর কঠোর। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ -এর অর্থ, যখন ইচ্ছা আপন শস্যক্ষেত্রে আস। এই অর্থ নয় যে, যেদিক দিয়ে ইচ্ছা আস। হায়েযের দিনগুলোতে নাভি থেকে হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাপড় বেঁধে রাখা স্ত্রীর জন্যে মোস্তাহাব। হায়েযের দিনগুলোতে স্ত্রীর সাথে আহার করা ও সাথে শয়ন করা জায়েয। সহবাসের পর পুনরায় সহবাস করতে চাইলে জননেন্দ্রিয় ধুয়ে নেয়া উচিত। রাতের শুরুভাগে সহবাস করা মাকরূহ। কেননা, এতে নাপাক অবস্থায় শয়ন করতে হয়। সহবাসের পর ঘুমাতে অথবা কিছু খেতে চাইলে নামাযের ওযুর মত ওযু করে নেয়া সুন্নত। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলামঃ আমাদের কেউ নাপাক অবস্থায় নিদ্রা যেতে পরে কি না? তিনি বললেনঃ হাঁ, যদি ওযু করে নেয়। এক্ষেত্রে ওযু ছাড়া নিদ্রা যাওয়ার অনুমতিও রয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রসূলে করীম (সাঃ) নাপাক অবস্থায় পানিতে হাত না লাগিয়ে ঘুমিয়ে থাকতেন।

সহবাসের অন্যতম আদব হচ্ছে বাইরে বীর্যস্খলন না ঘটানো; বরং বীর্যস্খলন গর্ভাশয়ের মধ্যেই হওয়া উচিত। আল্লাহ যাকে সৃষ্টি করতে চাইবেন সে তো সৃষ্টি হবেই। এমতাবস্থায় বীর্যস্খলন প্রত্যাহার করায় কি লাভ? এর পর বাইরে বীর্যস্খলন ঘটানো বৈধ কি না, এ ব্যাপারে আলেমগণের চারটি বিভিন্ন মাযহাব রয়েছে। কোন কোন আলেম সর্বাবস্থায় একে বৈধ বলেন। কেউ কেউ সর্বাবস্থায় হারাম বলেন। কারও মতে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে বৈধ এবং সম্মতি ছাড়া অবৈধ। কোন কোন আলেম বলেন, এটা বাঁদীর সঙ্গে বৈধ এবং স্বাধীন নারীর সাথে অবৈধ।

আমাদের মতে বিশুদ্ধ মাযহাব হচ্ছে, এ কাজটি বৈধ এবং উত্তম দিক বর্জনের অর্থে মাকরূহ। এটা তেমনি মাকরূহ, যেমন বলা হয়, যিকির ও নামায ব্যতীত মসজিদে চুপচাপ বসে থাকা মাকরূহ। এটা মাকরূহ তাহরীমীও নয়, তানযিহীও নয়। কেননা, এর নিষেধাজ্ঞা কোরআন হাদীসে প্রমাণিত নেই।

অতঃপর জানা উচিত, গর্ভপাত করা এবং জীবন্ত শিশু প্রোথিত করা পাপ। কেননা, এতে একটি বিদ্যমান বস্তুর উপর অত্যাচার চালানো হয়। এর পর বিদ্যমান হওয়ারও কয়েকটি স্তর আছে।

(১) বীর্য গর্ভাশয়ে পতিত হওয়া এবং স্ত্রীর বীর্যের সাথে মিলে জীবন লাভের যোগ্য হওয়া। এমতাবস্থায় একে নষ্ট করা পাপ। (২) যদি এটা মাংসপিণ্ড হয়ে যায়, তখন নষ্ট করা পাপ পূর্বের তুলনায় বেশী। (৩) যদি সন্তান পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায় এবং তাতে প্রাণ সঞ্চার হয় তখন নষ্ট করা আরও বড় পাপ। (৪) যদি সন্তান জীবিতাবস্থায় মাতৃগর্ভে থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখন নষ্ট করা সর্বাধিক অন্যায় কাজ।

আমরা গর্ভাশয়ে বীর্য পতিত হওয়াকে অস্তিত্ব লাভের প্রাথমিক স্তর বলেছি– পুরুষাঙ্গ থেকে বীর্যস্খলনকে বলিনি। এর কারণ ভ্রূণ কেবল পুরুষের বীর্যের দ্বারা তৈরী হয় না; বরং পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের বীর্যের সংমিশ্রণে অথবা পুরুষের বীর্য ও হায়েযের রক্তের সংমিশ্রণে তৈরী হয়। জনৈক বিশ্লেষক লেখেছেন, মাংসপিণ্ড আল্লাহ তাআলার আদেশে হায়েযের রক্ত দ্বারা গঠিত হয়। এর সাথে রক্তের সম্পর্ক দুইয়ের সাথে দুধের সম্পর্কের অনুরূপ। হায়েযের রক্ত জমাট হওয়ার জন্যে পুরুষের বীর্যের সংমিশ্রণ জরুরী; যেমন দুধ জমাট বাঁধার জন্যে জমাট দইয়ের সংমিশ্রণ শর্ত। মোট কথা, বীর্য জমাট হওয়ার কাজে নারীর বীর্য একটি স্তম্ভ এবং নারী-পুরুষ উভয়ের বীর্য সন্তানের অস্তিত্ব লাভের জন্যে এমন, যেমন ক্রয়-বিক্রয়ের অস্তিত্ব লাভে এক পক্ষের প্রস্তাব ও অপর পক্ষের গ্রহণ হয়ে থাকে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি বিক্রয়ের প্রস্তাব করে এবং অপর পক্ষ তা গ্রহণ না করে, তবে অপর পক্ষকে বিক্রয় ভেঙ্গে দেয়ার দোষে দোষী বলা হবে না। হাঁ, প্রস্তাব ও গ্রহণ উভয়টি হয়ে যাওয়ার পর মুখ ফিরিয়ে নেয়া বিক্রয় ভঙ্গ করা বলা হবে। পুরুষের পৃষ্ঠদেশে বীর্য থাকলে যেমন সন্তান সৃষ্টি হয় না, তেমনি পুরুষাঙ্গ থেকে বের হওয়ার পরেও সন্তান সৃষ্টি হয়

না, যে পর্যন্ত নারীর বীর্য অথবা হায়েযের রক্তের সাথে মিশ্রিত না হয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, বাইরে বীর্যস্খলন উপরোক্ত কারণে মাকরূহ না হলেও কুনিয়তের কারণে মাকরূহ হবে। কেননা খারাপ নিয়তেই এ ধরনের কাজ করা হয়, যাতে কিছু গোপন শেরকের লেশ থাকে। এর জওয়াব, পাঁচ প্রকার নিয়ত এ কাজের কারণ হয়ে থাকে।

প্রথম নিয়ত বাঁদীদের বেলায়। তা হচ্ছে, পুরুষ দেখে, বাঁদীর গর্ভ থেকে সন্তান হলে বাঁদী মুক্ত হওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। ফলে সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই এমন উপায় করা প্রয়োজন যাতে বাঁদী চিরকাল তার বাঁদী থাকে। বলাবাহুল্য, আপন মালিকানা বিনষ্ট হওয়ার কারণাদি দূর করা নিষিদ্ধ নয়।

দ্বিতীয় নিয়ত স্ত্রীর রূপ-লাবণ্য ও স্বাস্থ্য অটুট রাখা; যাতে সে স্বাস্থ্যবতী ও প্রাণবন্ত থাকে। কেননা, প্রসব বেদনার মধ্যে অনেক বিপদাশংকা থাকে। বলাবাহুল্য, এ ধরনের নিয়তও নিষিদ্ধ নয়।

তৃতীয় নিয়ত সন্তানের সংখ্যাধিক্যের কারণে ব্যয় বেড়ে যাওয়ার আশংকা করা। এটাও নিষিদ্ধ নয়, যাতে মানুষকে অধিক আমদানীর শ্রম স্বীকার করতে এবং অবৈধ আমদানীর পথে পা বাড়াতে না হয়। কেননা, সাংসারিক ব্যয় কম থাকা দ্বীনদারীর জন্য সহায়ক। তবে وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا বাক্যে আল্লাহ রিযিকের যে ওয়াদা করেছেন, তার উপর ভরসা করার মধ্যেই রয়েছে মাহাত্ম্য ও পূর্ণতা। সুতরাং এই তৃতীয় প্রকার নিয়ত করলে একটি মহৎ ও উত্তম বিষয় বর্জন করা হয়, কিন্তু পরিণামের দিকে লক্ষ্য করে আমরা এটা নিষিদ্ধ বলতে পারি না।

চতুর্থ নিয়ত হচ্ছে এ বিষয়ের আশংকা যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাদেরকে বিবাহ দিতে হবে এবং কাউকে জামাতা করার কলংক অর্জন করতে হবে। এ কলংকের ভয়ে আরবরা কন্যা সন্তানকে হত্যা করত এবং জীবন্ত পুঁতে ফেলত। এ নিয়ত অবশ্যই মহাপাপ। এ নিয়তে কেউ গর্ভাশয়ের বাইরে বীর্যস্খলন ঘটালে সে গোনাহগার হবে।

পঞ্চম নিয়ত স্বয়ং স্ত্রীর বাধাদান। সে গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরে বীর্যস্খলনে সম্মত হয় না। কারণ, সে নিজেকে ইযযতের অধিকারিণী মনে করে,

অতিমাত্রায় পরিচ্ছন্ন থাকতে চায় এবং প্রসব বেদনা, নেফাস ও স্তন্যদান থেকে সযত্নে বেঁচে থাকে। এ ধরনের নিয়ত খুবই গর্হিত। খারেজী সম্প্রদায়ের মহিলাদের এরূপ অভ্যাস ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বসরায় তশরীফ নিয়ে গেলে এমনি এক মহিলা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি তাকে কাছেই আসতে দেননি।

মোট কথা, জন্মশাসন দূষণীয় নয় যদি তা সঠিক নিয়তে করা হয়। এখন প্রশ্ন হয়, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا যেব্যক্তি সন্তান সন্ততির ভয়ে বিবাহ বর্জন করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ আপনি বিবাহ বর্জন ও বাইরে বীর্যস্খলনকে একই রূপ বলেন এবং সন্তানের ভয়ে একে মাকরূহ বলেন না! এর জওয়াব, আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়– এর অর্থ, সে আমাদের অনুরূপ এবং আমাদের পথ ও সুন্নতের অনুসারী নয়। আমাদের সুন্নত হচ্ছে উত্তম কাজ করা। আবার প্রশ্ন হয়, অন্যত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ কাজকে ذالك الواد الخفى (গোপন সন্তান প্রোথিতকরণ) বলেছেন, এর পর وَاِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ আয়াতখানি তেলাওয়াত করেছেন। এটি সহীহ্ হাদীসের রেওয়ায়েত। এর জওয়াব, সহীহ্ রেওয়ায়েতে এর বৈধতাও বর্ণিত হয়েছে। কাজেই উপরোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা মাকরূহে তাহরীমী হওয়া প্রমাণিত হয় না। আরও প্রশ্ন হয়, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ বাইরে বীর্যস্খলন ঘটানো ক্ষুদ্রাকারের জীবন্ত প্রোথিতকরণ। আমরা এর জওয়াবে বলি, হযরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তি একটি 'কিয়াস' তথা অনুমান। তিনি অস্তিত্বকে নিশ্চিত ধরে নিয়ে তা দূর করা ক্ষুদ্রাকারের জীবন্ত প্রোথিতকরণ বলেছেন। এই কিয়াস দুর্বল। তাই হযরত আলী (রাঃ) এটা শুনে মেনে নেননি এবং বলেন, কয়েকটি স্তর অতিক্রম করা ছাড়া জীবন্ত প্রোথিতকরণ প্রমাণিত হয় না। এর পর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন, যাতে স্তরগুলো বর্ণিত হয়েছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ـ

অর্থাৎ, আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তাকে বীর্যের আকারে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এর পর আমি বীর্যকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এর পর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি। অবশেষে তাকে এক নতুন সৃষ্টিরূপে দাঁড় করিয়েছি। এর পর তিনি وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ আয়াতটি পাঠ করলেন। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাসের উপরোক্ত কিয়াস কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে? কেননা বোখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে–

كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل -

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে যখন কোরআন নাযিল হচ্ছিল, তখন আমরা আযল (বাইরে বীর্যস্খলন) করতাম। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে–

كنا نعزل فبلغ ذلك نبى الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا -

অর্থাৎ, আমরা আযল করতাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এই সংবাদ পৌছলে তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেননি।

হযরত জাবের থেকে আর একটি সহীহ্ রেওয়ায়েত রয়েছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ আমার একটি বাঁদী আছে। সে খেদমত করে এবং বৃক্ষে পানি দেয়। আমি তার সাথে সহবাস করি, কিন্তু আমি চাই না, তার গর্ভ সঞ্চার হোক।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ

اعزل عنها ان شئت فانه سياتيها ما قدرلها -

অর্থাৎ, তুমি ইচ্ছা করলে তার সাথে আযল কর, কিন্তু যা তার ভাগ্যে নির্ধারিত রয়েছে তা আসবেই। কয়েকদিন পর লোকটি আবার এসে আরজ করল ঃ আমার সে বাঁদী গর্ভবতী হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, তার ভাগ্যে লেখা সন্তান অবশ্যই আসবে। এসব রেওয়ায়েত বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে।

একাদশ আদব সন্তান সংক্রান্ত। প্রথম, ছেলে সন্তান হলে অধিক খুশী এবং কন্যা সন্তান হলে মনঃক্ষুণ্ন হবে না। কেননা, কেউ জানে না তার জন্যে এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি মঙ্গলজনক; বরং গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, কন্যা সন্তানের মধ্যে নিরাপত্তা ও সওয়াব অধিক। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তির একটি কন্যা থাকে এবং সে তাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দান করে, লালন-পালন করে ও তার উপর আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত সম্পূর্ণ করে, সেই কন্যা তার জন্যে ডানে বামে দোযখের আড়াল হয়ে তাকে জান্নাতে পৌঁছাবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তান লাভ করে এবং তারা যতদিন পিতার কাছে থাকে, ততদিন পিতা তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে, সেই কন্যাদ্বয় তাকে জান্নাতে দাখিল করবে। অন্য এক রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ)-এরশাদ করেন ঃ যেব্যক্তি বাজার থেকে নতুন বস্তু আপন সন্তানদের জন্যে কিনে আনে, সে যেন তাদের জন্যে খয়রাত নিয়ে আসে। তার উচিত এই বস্তু পুত্রদের পূর্বে কন্যাদের মধ্যে বন্টন শুরু করা। কেননা, যেব্যক্তি কন্যাকে খুশী করে, সে যেন আল্লাহ তা'আলার ভয়ে ক্রন্দন করে। যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে, আল্লাহ তার উপর দোযখ হারাম করে দেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من كانت له ثلاث بنات او اخوات نصبر على لاواتهن وصنواتهن ادخله الله الجنة بفضل رحمة اياهن -

অর্থাৎ, যেব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান অথবা বোন থাকে এবং তাদের বিপদাপদ ও নির্মমতায় সবর করে, আল্লাহ তাকে কন্যাদের প্রতি করুণা করার কল্যাণে জান্নাতে দাখিল করবেন। এক ব্যক্তি আরজ করল ঃ যদি দু'কন্যা থাকে? তিনি বললেন ঃ দু'কন্যার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হবে। এক ব্যক্তি বলল ঃ একজন হলে? তিনি বললেন ঃ একজন হলেও।

দ্বিতীয়, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুর কানে আযান দেবে। হযরত রাফে (রাঃ)-এর পিতা বর্ণনা করেন ঃ হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গর্ভ থেকে হযরত হাসান (রাঃ) ভূমিষ্ঠ হলে রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর কানে আযান দিয়েছেন। আমি এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখছি। আরও বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন–

من ولد له مولود فاذن فى اذنه اليسرى دفعت عنه ام الصبيان .

অর্থাৎ, যার কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, অতঃপর সে তার বাম কানে আযান দেয়, সেই সন্তান 'উম্মুছ ছিবইয়ান' রোগের আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে। যখন শিশুর মুখ খোলে, তখন সর্বপ্রথম তাকে কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' শিক্ষা দেয়া এবং সপ্তম দিনে খতনা করা মোস্তাহাব। এ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

তৃতীয়, শিশুর উত্তম নাম রাখবে। এটাও শিশুর হক। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন– اذا سميتم فعبدوا অর্থাৎ, যখন নাম রাখ, তখন যেন নামের প্রথম অংশ 'আবদ' (বান্দা) হয়। احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক প্রিয় নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। سموا باسمى ولاتكنوا بكنيتى অর্থাৎ, তোমরা আমার নামে নাম রাখ। তবে আমার ডাকনামে ডাকনাম রেখো না। আলেমগণ বলেন ঃ এ নিষেধাজ্ঞা কেবল রসূলে করীম (সাঃ)-এর আমলে ছিল। তখন তাঁকে 'আবুল কাসেম' নামে ডাকা হত। এখন অন্যের জন্যে এই নাম রাখা দূষণীয় নয়। তবে তাঁর নাম ও ডাকনাম এক ব্যক্তির জন্যে একত্রিত করা উচিত নয়, হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। কেউ কেউ বলেন ঃ এই নিষেধাজ্ঞাও কেবল তাঁর আমলে ছিল। এক ব্যক্তির ডাকনাম ছিল আবু ঈসা (ঈসার বাপ)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) শুনে বললেন ঃ ঈসা (আঃ)-এর তো বাপ ছিল না। এ থেকে জানা গেল, আবু ঈসা নাম রাখা মাকরূহ। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যায়, তারও নাম রাখা উচিত। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ বলেন ঃ আমি শুনেছি গর্ভপাতের সন্তান কেয়ামতের দিন পিতার পেছনে পেছনে ফরিয়াদ করবে এবং বলবে, তুমি আমাকে নামহীন ছেড়ে দিয়ে নষ্ট করেছ। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ একথা শুনে বললেন ঃ তা কেমন করে হবে? পিতা তো জানতেও পারে না যে, গর্ভপাতজনিত সন্তান ছেলে না মেয়ে। এমতাবস্থায় সে কিরূপে নাম রাখবে? জওয়াবে আবদুর রহমান বললেন ঃ অনেক নাম আছে, যা পুরুষ ও নারী উভয়েরই হতে পারে; যেমন আম্মারা, তালহা, ওতবা ইত্যাদি। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

انكم تدعون يوم القيامة باسمائكم واسماء ابائكم فاحسنوا اسمائكم .

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের নামে ও তোমাদের পিতার নামে আহূত হবে। অতএব তোমরা সুন্দর সুন্দর নাম রাখ। কারও নাম খারাপ থাকলে তা বদলে দেয়া মোস্তাহাব। রসূলে করীম (সাঃ) 'আছ' (পাপী) -এর নাম পাল্টে আবদুল্লাহ রেখেছিলেন। হযরত যয়নব (রাঃ)-এর নাম ছিল বাররাহ। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ তুমি নিজেই নিজেকে ভাল বল। উল্লেখ্য, 'বাররাহ' অর্থ নিরপরাধ। এর পর তিনি এই নাম পাল্টে যয়নব রাখলেন।

চতুর্থ, সন্তান জন্ম গ্রহণের পর আকীকা করবে। পুত্রের জন্যে দু'টি ছাগল এবং কন্যার জন্য একটি ছাগল জবাই করবে। আকীকার জন্তু নর হোক কিংবা মাদী, তাতে কিছু আসে যায় না। হযরত আয়েশা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রসূলে করীম (সাঃ) পুত্রের আকীকায় দুটি ছাগল এবং কন্যার আকীকায় একটি ছাগল জবাই করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বর্ণিত আছে, তিনি হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর আকীকায় একটি ছাগল জবাই করেন। এ থেকে জানা গেল, এক ছাগল জবাই করলেও ক্ষতি নেই। ভূমিষ্ঠ শিশুর চুলের ওজনের সমপরিমাণ সোনা অথবা রূপা খয়রাত করা সুন্নত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর জন্মের সপ্তম দিন হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে এরশাদ করেন ঃ তার চুল মুণ্ডন করে চুলের সমপরিমাণ রূপা সদকা করে দাও। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আকীকার জন্তুর হাড়া ভাঙ্গা উচিত নয়।

পঞ্চম, সন্তানের কণ্ঠ তালুতে খোরমা অথবা মিষ্টি মেখে দেবে। আবু বকর তনয়া হযরত আসমা (রাঃ) বলেন ঃ কোবায় আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়র আমার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হলে আমি তাকে এনে রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর কোলে তুলে দিলাম। তিনি একটি খোরমা চিবিয়ে তার রস আবদুল্লাহর মুখে দিলেন। তাই সর্বপ্রথম তার পেটে যা পড়ে, তা ছিল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর লালা মোবারক। এর পর তিনি তার তালুতে খোরমা মেখে দিলেন এবং বরকতের দোয়া করলেন । মুহাজিরদের মধ্যে সর্বপ্রথম শিশু সে-এই জন্মগ্রহণ করেছিল। তাই তার জন্মগ্রহণে

মুসলমানদের আনন্দের সীমা ছিল না; কেননা, লোকেরা বলাবলি করতো যে, ইহুদীরা তোমাদের উপর জাদু করেছে। তোমাদের সন্তান সন্ততি হবে না।

দ্বাদশ আদব তালাক সংক্রান্ত। প্রথম, তালাক একটি বৈধ কাজ, কিন্তু বৈধ কাজসমূহের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কাছে এর চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় দ্বিতীয়টি নেই। এটা তখনই বৈধ হয়, যখন এর দ্বারা অন্যায় উৎপীড়ন উদ্দেশ্য না থাকে, অর্থাৎ, স্ত্রীকে তালাক দেয়া একটি উৎপীড়ন। অপরকে উৎপীড়ন করা জায়েয নয়; কিন্তু স্ত্রী দোষী হলে অথবা স্বামীর তালাক দেয়ার প্রয়োজন হলে জায়েয হবে।

সেমতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ـ

অর্থাৎ, স্ত্রীরা যদি তোমাদের অনুগত হয় তবে বিচ্ছিন্নতার পথ তালাশ করো না।

যদি স্বামীর পিতা পুত্র বধূকে মন্দ মনে করে, তবে তাকে তালাক দিয়ে দেয়া উচিত। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) তাকে অপছন্দ করতেন এবং আমাকে তালাক দিতে বলতেন। আমি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অভিমত চাইলে তিনি বললেন ঃ হে ইবনে ওমর, স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। এ হাদীস থেকে জানা যায়, পিতার হক অগ্রে, কিন্তু এটা তখন, যখন পিতার অপছন্দ করাটা কুউদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়। যেমন হযরত ওমরের মত পিতার হক নিঃসন্দেহে অগ্রে। স্ত্রী যদি স্বামীকে পীড়ন করে অথবা তার পরিবারকে খারাপ বলে, তবে স্ত্রী দোষী। তেমনি যদি দুশ্চরিত্র হয় ও দ্বীনদার না হয়, তা হলেও দোষী। কোরআনে আছে– وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ (মহিলারা বের হবে না; কিন্তু যদি কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজ করে।) এ আয়াতের তফসীরে হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ স্ত্রী পরিবারের লোকজনকে মন্দচারী বললে এবং স্বামীকে কষ্ট দিলে এও তার নির্লজ্জ কাজ। যদিও এ বিষয়বস্তুটি ইদ্দত সম্পর্কিত; কিন্তু এর দ্বারা আসল উদ্দেশ্য বুঝা যায়। যদি উৎপীড়ন স্বামীর পক্ষ থেকে হয়, তবে স্ত্রীর উচিত কিছু অর্থসম্পদ দিয়ে স্বামীর কবল থেকে মুক্তি লাভ করা। স্ত্রীকে যে পরিমাণ অর্থসম্পদ

দেয়া হয়েছে, তার চেয়ে বেশী নেয়া এক্ষেত্রে স্বামীর জন্যে মাকরূহ। স্ত্রীর পক্ষ থেকে অর্থসম্পদ দেয়ার কথা এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (স্ত্রী মুক্তিপণস্বরূপ যা দেয়, তাতে তাদের উভয়ের কোন গোনাহ নেই।) মোট কথা, স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে যতটুকু পায়, সে পরিমাণ অথবা তার চেয়ে কম মুক্তিপণ দেয়া উচিত। স্ত্রী অহেতুক তালাক প্রার্থনা করলে সে গোনাহগার হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ ايما امراة سألت زوجها طلاقها من غير باس لم ترح رائحة الجنة অর্থাৎ, যে স্ত্রী কোন ভয় ও প্রয়োজন ছাড়া স্বামীর কাছে তালাক প্রার্থনা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না। অন্য এক রেওয়ায়েতে فالجنة عليها حرام –তার উপর জান্নাত হারাম বলা হয়েছে।

তালাক দেয়ার ব্যাপারে স্বামীর উচিত চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা– (১) যে তোহর তথা হায়েয থেকে পাক থাকার সময়ে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেনি, সেই তোহরে তালাক দেয়া। কেননা, যে তোহরে সহবাস হয়ে গেছে, সে তোহরে তালাক দেয়া বেদআত ও হারাম। যদিও তালাক হয়ে যায়। কেননা, এমতাবস্থায় স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ হয়ে যায়। সুতরাং কেউ এরূপ তালাক দিলে তার উচিত রুজু করা। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দিলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওমরকে বললেন ঃ তাকে রুজু করতে বল। এর পর যখন তার স্ত্রী হায়েয থেকে পাক হবে, এর পর আবার যখন হায়েয হবে ও আবার পাক হবে, তখন ইচ্ছা করলে তালাক দেবে। নতুবা থাকতে দেবে। এখানে হযরত ইবনে ওমরকে দু'তোহর অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে, যাতে রুজু করার উদ্দেশ্য কেবল তালাক দেয়া না হয়ে যায়। (২) তালাক দেবে, দুই অথবা তিন তালাক এক সাথে দেবে না। কেননা, ইদ্দতের পর এক তালাক দ্বারাও সেই উপকার হয়, যা তিন তালাক দ্বারা হয়; অর্থাৎ, স্ত্রী বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়, কিন্তু এক তালাক দেয়ার মধ্যে আরও দু'টি উপকার আছে। এক, যদি তালাক দেয়ার পর স্বামী অনুতপ্ত হয়, তবে ইদ্দতের দিনগুলোতে রুজু করতে পারে। দুই, ইদ্দতের পর আবার এই স্ত্রীকে নতুনভাবে বিবাহ করতে পারে। যদি তিন তালাক দেয়ার পর অনুতপ্ত হয়, তবে হালাল করার প্রয়োজন হবে এবং দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হবে।

হালাল একটি নিন্দনীয় কাজ। এতে অপরের স্ত্রীর মধ্যে নিয়ত লেগে থাকে এবং তার তালাকের অপেক্ষা করা হয়। তিন তালাকই এসব অনিষ্টের কারণ। এক তালাক দিলে উদ্দেশ্যও সাধিত হয়ে যায় এবং অনিষ্টও হয় না। তবে তিন তালাক একত্রে দেয়া হারাম নয়; বরং এসব অনিষ্টের কারণে মাকরূহ। (৩) সম্প্রীতির পরিবেশে তালাক দেবে এবং নির্মমতা ও ঘৃণা সহকারে তালাক দেবে না। আকস্মিক বিরহের কারণে স্ত্রীর যে কষ্ট হবে, তা দূর করার জন্যে হাদিয়াস্বরূপ স্ত্রীকে কিছু দিয়ে তার মন খুশী করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَتِّعُوهُنَّ অর্থাৎ, যে স্ত্রীর বিবাহে মোহরানা উল্লেখ করা হয়নি তাকে 'মুতআ' দেয়া ওয়াজিব। (৪) বিবাহ ও তালাক উভয় ক্ষেত্রে স্ত্রীর গোপনীয়তা প্রকাশ করবে না। এ সম্পর্কে হাদীসে শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। জনৈক বুযুর্গ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল– স্ত্রীর প্রতি আপনার সন্দেহ কি? তিনি বললেন ঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপন স্ত্রীর গোপন রহস্য ফাঁস করে না। এর পর যখন তিনি তালাক দিয়ে দিলেন, তখন জিজ্ঞেস করা হল, আপনি তাকে কেন তালাক দিলেন? তিনি বললেন ঃ আমি বেগানা স্ত্রীর গোপন তথ্য কেন প্রকাশ করব? মোট কথা, স্বামীর উপর স্ত্রীর যেসকল হক রয়েছে, এ পর্যন্ত সেগুলো বর্ণিত হল।

স্ত্রীর উপর স্বামীর হক ঃ এক্ষেত্রে চূড়ান্ত কথা, বিবাহ প্রকারান্তরে বাঁদী হওয়ার নামান্তর বিধায় স্ত্রী যেন স্বামীর বাঁদী হয়ে যায়। সুতরাং স্বামীর আনুগত্য করা সর্বাবস্থায় তার উপর ওয়াজিব। স্ত্রীর উপর স্বামীর হক যে বেশী, এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

ايما امراة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة -

অর্থাৎ, যে স্ত্রী এমতাবস্থায় মারা যায় যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

কোন এক ব্যক্তি সফরে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে বলে গেল ঃ উপর তলার কক্ষ থেকে নীচে নামবে না। নীচে তার পিতা বসবাস করত। ঘটনাক্রমে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। স্ত্রী নীচে পিতার কাছে নামার অনুমতি চেয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে লোক পাঠালে তিনি বললেন ঃ স্বামীর আদেশ পালন কর। শেষ পর্যন্ত পিতা মারা গেলে সে আবার অনুমতি

প্রার্থনা করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবার বললেন ঃ স্বামীর আদেশ পালন কর। ফলে পিতা সমাধিস্থও হয়ে গেল; কিন্তু সে নীচে নামল না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই মহিলাকে বলে পাঠালেন ঃ তুমি যে স্বামীর আদেশ পালন করেছ, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তোমার পিতার মাগফেরাত করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে ঃ

اذا صلت المراة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها دخلت جنة ربها -

অর্থাৎ, যখন স্ত্রী পাঞ্জেগানা নামায পড়ে, রমযান মাসের রোযা রাখে, আপন গুপ্ত অঙ্গের হেফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তখন সে তার পালনকর্তার জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এ হাদীসে স্বামীর আনুগত্যকে ইসলামের রোকনসমূহের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ গর্ভবতী নারী, সন্তান প্রসবকারিণী নারী, দুগ্ধদানকারিণী নারী, সন্তানদের প্রতি দয়াশীলা নারী, স্বামীর সাথে যে অসদাচারণ করে, যদি তা না করত, তবে তাদের মধ্যে যারা নামাযী, তারা জান্নাতে প্রবেশ করত। এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ

اطلعت فى النار فاذا اكثر اهلها النساء فقلن لم يا رسول الله قال يكثرن اللعن ويكفرن العشيرة -

অর্থাৎ, আমি দোযখে উঁকি দিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ বাসিন্দাই মহিলা। মহিলারা আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, এর কারণ কি ? তিনি বললেন ঃ মহিলারা অভিসম্পাত বেশী করে এবং স্বামীদের না-শোকরী করে।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখলাম, তাতে পুরুষ জান্নাতীদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা খুব নগণ্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ মহিলারা কোথায়? উত্তর হল ঃ দু'টি লাল বস্তু তাদের জান্নাতে আসার পথে বাধা হয়েছে। একটি স্বর্ণ ও অপরটি জাফরান। অর্থাৎ, অলংকার ও রঙ্গিন পোশাক। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ কোন এক যুবতী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করল ঃ ইয়া

রসূলাল্লাহ্, আমি যুবতী। মানুষ আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু বিবাহ আমার কাছে ভাল লাগে না। এখন জানতে চাই, স্ত্রীর উপর স্বামীর হক কি? তিনি বললেন ঃ ধরে নেয়া যাক, স্বামীর আপাদমস্তক পুঁজে ভর্তি। যদি স্ত্রী এই পুঁজ চেটে নেয়, তবুও তার শোকর আদায় করতে পারবে না। মহিলা বলল ঃ আমি বিবাহ করব কি? তিনি বললেন ঃ করে নাও। বিবাহ করা উত্তম । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ খাসআম গোত্রের জনৈকা মহিলা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে আরজ করল ঃ আমি স্বামীহীনা, বিবাহ করতে চাই। এখন স্বামীর হক কি, জানতে চাই। তিনি বললেন ঃ স্বামীর এক হক, সে যদি উটের পিঠে থেকেও সহবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে স্ত্রী অস্বীকার করতে পারবে না। আরেক হক, কোন বস্তু তার গৃহ থেকে তার অনুমতি ব্যতীত কাউকে দেবে না। দিলে তুমি রোযা রেখে কেবল ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্তই থাকবে। তোমার রোযা কবুল হবে না। যদি তুমি স্বামীর আদেশ ছাড়া ঘর থেকে বের হও, তবে ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত এবং তওবা না করা পর্যন্ত ফেরেশতারা তোমার প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে। এক হাদীসে আছে–

لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المراة ان تسجد لزوجها ـ

অর্থাৎ, যদি আমি কাউকে সেজদা করার নির্দেশ করতাম, তবে অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ করতাম যেন সে তার স্বামীকে সেজদা করে।

এরূপ বলার কারণ, স্ত্রীর উপর স্বামীর হক বেশী । রসূলে আকরাম (সাঃ) আরও বলেন ঃ স্ত্রী আল্লাহ্র পবিত্র সত্তার অধিকতর নিকটবর্তী তখন হয়, যখন সে তার কক্ষের অভ্যন্তরে থাকে। স্ত্রীর পক্ষে গৃহের আঙ্গিনায় নামায পড়া মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। আর কক্ষের ভেতরকার কক্ষে নামায পড়া কক্ষের ভেতরে নামায পড়ার তুলনায় শ্রেয়ঃ। এটা বলার কারণ, স্ত্রীর অবস্থার উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতা পর্দার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যে অবস্থায় পর্দা বেশী হবে, সে অবস্থাই তার জন্যে উত্তম। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ المراة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان (নারী হল নগ্নতা । সে যখন বের হয় তখন শয়তান উঁকি দিয়ে দেখে।) তিনি আরও বলেন ঃ স্ত্রীর দশটি নগ্নতা রয়েছে। সে যখন বিবাহ করে তখন স্বামী একটি নগ্নতা ঢেকে দেয়। আর যখন সে মারা যায়, তখন কবর দশটি নগ্নতা আবৃত করে দেয়। মোট কথা, স্বামীর হক স্ত্রীর উপর অনেক। তন্মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ দুটি– একটি আত্মরক্ষা ও পর্দা এবং অপরটি প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিসপত্র দাবী না করা এবং স্বামীর উপার্জন হারাম হলে তা থেকে বেঁচে থাকা। সেমতে পূর্ববর্তীকালে নারীর অভ্যাস তাই ছিল। তখন কোন পুরুষ সফরে গেলে তার স্ত্রী ও কন্যারা তাকে বলত ঃ খবরদার! হারাম উপার্জন করবে না। আমরা ক্ষুধা ও কষ্টে সবর করব; কিন্তু দোযখের আগুনে সবর করতে পারব না। সে যুগের এক ব্যক্তি সফরের ইচ্ছা করলে তার প্রতিবেশীদের মনে সন্দেহ হল। সবাই তার স্ত্রীকে বলল ঃ তুমি তার সফরে সম্মত হচ্ছ কেন? সে তো তোমার খরচের জন্যে কিছুই রেখে যাচ্ছে না! স্ত্রী বলল ঃ আমি আমার স্বামীকে যেদিন থেকে দেখেছি, ভক্ষকই পেয়েছি– রিযিকদাতা পাইনি। আমার পালনকর্তা আমার রিযিকদাতা। এখন ভক্ষক চলে যাবে এবং রিযিকদাতা আমার কাছে থাকবে। রাবেয়া বিনতে ইসমাঈল আহমদ ইবনে আবুল হাওয়ারীর কাছে নিজের বিবাহের পয়গাম দিলে এবাদতের কারণে তিনি তা অপছন্দ করেন এবং বলেন ঃ স্ত্রীর খাহেশ আমার নেই। আমি এবাদতেই মগ্ন থাকতে চাই। রাবেয়া বললেনঃ আমি আমার অবস্থায় তোমার চেয়ে অধিক মগ্ন রয়েছি। পুরুষের খাহেশ আমার নেই, কিন্তু আমি আমার পূর্ব স্বামীর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক ধন সম্পদ পেয়েছি। আমি চাই তুমি এসব ধন-সম্পদ তোমার সঙ্গীদের মধ্যে ব্যয় কর এবং তোমার মাধ্যমে আমি সজ্জনদের পরিচয় লাভ করি। আহমদ বললেন ঃ আমি আগে আমার ওস্তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নেই। অতঃপর তিনি হযরত সোলায়মান দারানীর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি রাবেয়ার কথা শুনে বললেন ঃ তাকে বিয়ে করে নাও। সে আল্লাহর ওলী। কেননা, এরূপ কথাবার্তা ওলীরা বলেন। আহমদ বলেন ঃ ইতিপূর্বে ওস্তাদ আমাকে বিবাহ করতে বারণ করতেন এবং বলতেন, আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে যে কেউ বিয়ে করেছে, সে-ই বদলে গেছে। এর পর আমি রাবেয়াকে বিয়ে

করলাম। এই রাবেয়াও সিরিয়ায় তেমনি ছিল, যেমন ছিল বসরায় রাবেয়া বসরী।

স্বামীর ধনসম্পদ অযথা ব্যয় না করা স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য; বরং সে স্বামীর ধনসম্পদের হেফাযত করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ স্ত্রীর জন্যে হালাল নয় যে, সে স্বামীর গৃহ থেকে তার অনুমতি ছাড়া কোন খাদ্যবস্তু অন্যকে দেবে। তবে খারাপ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে কাঁচা খাদ্য সামগ্রী দিতে পারে। যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী কাউকে খাওয়ায়, তবে সওয়াব স্বামী নেবে এবং গোনাহ স্ত্রীর উপর থাকবে। পিতামাতার উপর কন্যা সন্তানের হক তাদেরকে অপরের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং স্বামীর সাথে সদ্ভাবে বসবাস করার শিক্ষা দেবে। বর্ণিত আছে, আসমা বিনতে খারেজা করারী তাঁর কন্যার বিয়ের সময় তাকে এরূপ উপদেশ দান করেন ঃ যে গৃহে তুমি এসেছিলে, এখন সেখান থেকে বের হয়ে এমন শয্যায় যাচ্ছ, যে সম্পর্কে তুমি ওয়াকিফহাল ছিলে না। তুমি এমন ব্যক্তির কাছে থাকবে, যার সাথে পূর্ব থেকে পরিচয় ছিল না। অতএব তুমি তার পৃথিবী হবে। ফলে সে তোমার আকাশ হবে। তুমি তার জন্যে শান্তির কারণ হলে সে তোমার সুখের কারণ হবে। তুমি তার বাঁদী হলে সে তোমার গোলাম হয়ে থাকবে। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তার কাছে যাবে না যে, তোমাকে ঘৃণা করে এবং দূরেও থাকবে না যে, দ্রুত ভুলে যায়; বরং সে তোমার কাছে থাকলে তুমি তার নিকটে থাকবে। সে আলাদা থাকলে তুমি দূরে থাকবে। তার নাক, কান ও চোখের দিকে লক্ষ্য রাখবে। সে যেন তোমার কাছ থেকে সুগন্ধি ছাড়া অন্য কিছুর ঘ্রাণ না পায়। সে যখন শুনে তখন যেন তোমার কাছ থেকে ভাল কথা শুনে এবং যখন দেখে তখন যেন ভাল কিছু দেখে।

স্ত্রীর আদবসমূহের মধ্যে একশ' কথার এক কথা, স্ত্রী আপন গৃহে বসে চরকায় সূতা কাটা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকবে। ছাদে আরোহণ করে এদিক ওদিক তাকাবে না। প্রতিবেশীদের সাথে কথা কম বলবে এবং নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া তাদের গৃহে যাবে না। স্বামীর উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে তার সম্মান করবে। প্রত্যেক কাজে তার সন্তুষ্টি কামনা করবে। নিজের ব্যাপারে ও স্বামীর ধন-সম্পদের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা

করবে না। স্বামীর অনুমতিক্রমে গৃহ থেকে বের হলেও পুরাতন কাপড়-চোপড়ে আবৃতা হয়ে বের হবে। সড়কের মধ্যস্থলে ও বাজার থেকে বেঁচে চলবে। সর্বপ্রযত্নে নিজের অবস্থার উন্নতি ও ঘর-কন্নায় নিয়োজিত থাকবে এবং নামায-রোযার সাথে সম্বন্ধ রাখবে। স্বামীর কোন বন্ধু দরজায় আওয়াজ দিলে যদি স্বামী গৃহে না থাকে, তবে তার সাথে কোন কথা না বলাই নিজের স্বামীর আত্মমর্যাদার দাবী। স্বামীকে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। খুব সেজেগুজে থাকবে এবং স্বামী সম্ভোগ করতে চাইলে তজ্জন্যে সর্বাবস্থায় প্রস্তুত থাকবে। সন্তানদের প্রতি স্নেহমমতা করবে। স্বামীর কথার প্রত্যুত্তর দেবে না। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার পূর্বে জান্নাতে যাওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে হারাম করেছেন, কিন্তু আমি এক মহিলাকে দেখব সে জান্নাতের দরজার দিকে আমার আগে আগে যেতে থাকবে। আমি জিজ্ঞেস করব, ব্যাপার কি, এই মহিলা আমার আগে যাচ্ছে? আমাকে বলা হবে; হে মুহাম্মদ (সাঃ)! এ মহিলা সুন্দরী রূপবতী ছিল। তার দুটি এতীম শিশু ছিল। সে তাদের ব্যাপারে সবর করেছে। ফলে তার যে দুর্দশা হওয়ার ছিল, তাই হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার এই আত্মত্যাগ পছন্দ করে তাকে এই মর্যাদা দান করেছেন। স্ত্রীর অন্যতম আদব হচ্ছে, স্বামীর সাথে আপন রূপ-লাবণ্য নিয়ে গর্ব না করা এবং স্বামী কুশ্রী হওয়ার কারণে তাকে হেয় মনে না করা। আসমায়ী বলেন ঃ আমি জঙ্গলে গিয়ে একজন নেহায়েত রূপসী মহিলাকে দেখলাম। সাথে তার স্বামীকে দেখলাম চরম কুশ্রী কদাকার। আমি মহিলাকে বললাম ঃ আশ্চর্যের বিষয়, তুমি এমন ব্যক্তির স্ত্রী হয়ে সুখী আছ! সে বলল ঃ চুপ কর। তুমি ভুল করছ। আসল ব্যাপার হচ্ছে সম্ভবতঃ সে তার স্রষ্টার সন্তুষ্টির কোন কাজ করেছে, যার বিনিময়ে আমাকে লাভ করেছে। আর খুব সম্ভব আমার দ্বারা স্রষ্টার মর্জির খেলাফ কোন কাজ হয়েছে, যার শাস্তিস্বরূপ আমি এই স্বামী পেয়েছি। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আমার জন্যে যা পছন্দ করেছেন তাতে আমি সন্তুষ্ট থাকব না কেন? আসমায়ী বলেন ঃ মহিলা আমাকে সম্পূর্ণ নিরুত্তর করে দিল। স্ত্রীর অন্যতম আদব, সে কোন অবস্থাতেই স্বামীকে পীড়ন করবে না। হযরত মোয়ায ইবনে

জাবালের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

لاتـؤذى امراة زوجـها فـى الـدنـيـا الا قـالت زوجـتـه مـن الـحور الـعيـن لاتـوذيـنـه قـاتـلـك الـلـه فـانـمـا هـو عـنـدك رحـيـل يـوشـك ان يـفـارقـك الـيـنـا ۔

অর্থাৎ. দুনিয়াতে যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীকে পীড়ন করে, তখন তার বেহেশতী হুর স্ত্রী দুনিয়ার স্ত্রীকে বলে ঃ তুমি ধ্বংস হও। তুমি তাকে পীড়ন করো না। সে-তো তোমার কাছে মুসাফির। সত্বরই তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর কর্তব্য হবে তার জন্যে চার মাস দশ দিনের বেশী শোক প্রকাশ না করা। এটা বিবাহের অন্যতম হক। স্ত্রী এই চার মাস দশ দিন সুগন্ধি ও সাজসজ্জা থেকে বেঁচে থাকবে। যয়নব বিনতে আবু সালামা বলেন ঃ আমি আবু সুফিয়ানের মৃত্যুর পর তার কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি হলুদ রঙের সুগন্ধি এনে আপন গালে মালিশ করলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমার সুগন্ধির কোন প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–

لايـحل لامرة تؤمـن بـالـلـه والـيـوم الاخر ان لا تـحد عـلـى مـيـت اكـثـر مـن ثـلـثـه ايـام الاعـلـى زوج اربـعـة اشـهـر وعـشـرة ۔

অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে– এমন কোন মহিলার জন্যে মৃতের কারণে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা বৈধ নয়, কিন্তু স্বামী মারা গেলে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। শোক পালনকালে স্ত্রী মৃত স্বামীর গৃহেই থাকবে। বাপের বাড়ী চলে যাওয়া জায়েয নয়। স্ত্রীর অন্যতম আদব, স্বামীর গৃহে যেসব কাজ সম্পাদন করা তার জন্যে সম্ভব, সেগুলো অম্লান বদনে করবে। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বর্ণনা করেন–

হযরত যোবায়রের সাথে আমার বিবাহ হলে তাঁর কোন ধন-সম্পদ ছিল না। না ছিল কোন গোলাম, না ছিল বাঁদী। কেবল একটি ঘোড়া ও পানি আনার জন্যে একটি উট ছিল। ফলে আমিই তার ঘোড়াকে ঘাস

পানি দিতাম এবং উটের জন্যে খোরমার বীচি কুটে খাবার দিতাম। পানি ভরে আনতাম এবং মশক সেলাই করতাম। এ ছাড়া আটা পিষতাম এবং দু'ক্রোশ দূর থেকে মাথায় বহন করে বীচি আনতাম। অবশেষে আমার পিতা হযরত আবু বকর (রাঃ) আমার কাছে একটি বাঁদী পাঠিয়ে দিলেন। এতে আমি অনেক কাজকর্ম থেকে মুক্তি পাই। একদিন আমার মাথায় বীচির বস্তা ছিল, তখন পথিমধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। সাহাবীগণও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি আমাকে নিজের পেছনে সওয়ার করিয়ে নেয়ার জন্যে আপন উষ্ট্রীকে বসার জন্যে ইশারা করলেন, কিন্তু পুরুষদের সাথে চলতে আমি লজ্জাবোধ করলাম এবং আমার স্বামীর আত্মমর্যাদাবোধ স্মরণ করলাম। কারণ, তিনি অত্যন্ত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার লজ্জা আঁচ করে চলে গেলেন। বাড়ি ফিরে আমি আমার স্বামী যোবায়রের কাছে এ ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, তুমি যে মাথায় বীচি বহন করেছ, এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সওয়ার হওয়ার তুলনায় আমার জন্যে কঠিনতর।

জীবিকা উপার্জন

প্রকাশ থাকে যে, পরম প্রভু ও কারণাদির স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা পরকালকে প্রতিদান ও শাস্তির কেন্দ্র সাব্যস্ত করেছেন এবং ইহকালকে করেছেন মেহনত ও উদ্যম সহকারে কর্মতৎপর হয়ে উপার্জন করার স্থান। কেবল পরকালীন চিন্তায় ব্যস্ত থাকার মধ্যেই ইহলৌকিক তৎপরতা সীমিত নয়; বরং জীবিকার চিন্তাও পরকালীন চিন্তার উপায় ও সহায়ক। সেমতে اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ (দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র) কথাটি প্রবাদ বাক্যের মতই প্রসিদ্ধ। ইহকাল থেকেই ক্রমান্বয়ে পরকালের পর্যায় আসে। আজকাল দুনিয়ার মানুষ এ ক্ষেত্রে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত– এক শ্রেণীর মানুষ জীবিকার মধ্যে এমনই বিভোর যে, পরকালের কথা ভুলেও চিন্তা করে না। এরা বিধ্বস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্তদের দল। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক পরকালের কর্মব্যস্ততায় জীবিকা থেকে উদাসীন। এরা উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছতে সক্ষম হবে। তৃতীয় শ্রেণীর লোক সমতার খুব নিকটবর্তী; অর্থাৎ, জীবিকার কাজকর্ম পরকালের জন্যেই করে। এরা মধ্যপন্থী ও মধ্যবর্তী সম্প্রদায়। বলাবাহুল্য, যেব্যক্তি জীবিকা অন্বেষণে নিজের জন্যে সততার পথ অপরিহার্য করে নেয় না, সে কখনও মধ্যবর্তিতার স্তর লাভ করতে সক্ষম হবে না এবং যে পর্যন্ত জীবিকা অন্বেষণে শরীয়তের আদবসমূহের অনুসারী হবে না, তার জন্যে দুনিয়া কখনও আখেরাতের ওসিলা হবে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য ও পেশার আদবসমূহ, উপার্জনের প্রকার ও পন্থাসমূহ পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবিকা উপার্জনের ফযীলত

পবিত্র কোরআন ও হাদীসে জীবিকা উপার্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا অর্থাৎ, এবং আমি দিনকে করেছি

জীবিকা আহরণের সময়। অনুগ্রহ প্রকাশ প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَائِشَ قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ, এতে নিহিত রেখেছেন তোমাদের জীবিকা কিন্তু তোমরা কমই শোকর কর।

এ আয়াতে জীবিকাকে নেয়ামত বলা হয়েছে এবং এর জন্যে শোকর তলব করা হয়েছে।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কৃপা (জীবিকা) অন্বেষণ করবে– এতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই।

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ, তোমার সাথে রয়েছে এমন লোক যারা যমীনে ভ্রমণ করে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করে।

فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ, অতঃপর ছড়িয়ে পড় পৃথিবীতে এবং অন্বেষণ কর আল্লাহর অনুগ্রহ।

এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ এই–

من الذنوب لايكفرها الا الهم فى المعيشة অর্থাৎ, কিছু গোনাহ আছে, যাকে জীবিকা উপার্জনের চিন্তাই দূর করতে পারে।

التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء অর্থাৎ, সত্যপরায়ণ ব্যবসায়ীকে কেয়ামতের দিন সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে একত্রিত করা হবে।

من طلب الدنيا حلا لا تعففا عن المسئلة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقى الله ووجهه كالقمر ليلة البدر -

অর্থাৎ, যেব্যক্তি হালাল উপায়ে দুনিয়া অর্জন করে হাত পাতা থেকে বাঁচার জন্যে, সন্তান-সন্ততির সুখের চেষ্টা করার জন্যে এবং প্রতিবেশীর

প্রতি দয়া করার জন্যে, সে পূর্ণিমার রাতের আলোকোদ্ভাসিত চাঁদের ন্যায় মুখমন্ডল নিয়ে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে।

একদিন রসূলে আকরাম (সাঃ) সাহাবীগণের সাথে বসে ছিলেন, এমন সময় জনৈক যুবক, সুঠাম কর্মতৎপর সাহাবীকে ভোরবেলায় কাজকর্মে মশগুল দেখে সকলেই বলল ঃ হায়, তার যৌবন ও কর্মতৎপরতা যদি আল্লাহর পথে ব্যয়িত হত! রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এরূপ বলো না। কেননা, সে যদি নিজেকে হাত পাতা থেকে বাঁচানোর জন্যে কাজকর্ম করে, তবে সে আল্লাহর পথেই রয়েছে। আর যদি সে নিজের বৃদ্ধ পিতা মাতা ও দুর্বল শিশুদের খাতিরে কাজকর্ম করে, যাতে অভাবগ্রস্ত না হয়, তবুও সে আল্লাহর পথেই ব্যস্ত রয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মানুষের প্রতি অমুখাপেক্ষী হওয়ার জন্যে কোন কাজকর্ম করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই পছন্দ করেন। আর যেব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে খেদমত নেয়ার উদ্দেশে এলেম শিক্ষা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অপছন্দ করেন। এক হাদীসে আছে- আল্লাহ তা'আলা পেশাজীবী ঈমানদারকে ভালবাসেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে-

احل ما اكل الرجل من كسبه (মানুষ যা খায়, তার মধ্যে সর্বাধিক হালাল হচ্ছে তার উপার্জন)। আরও বলা হয়েছে-তোমরা ব্যবসাবাণিজ্য কর। কেননা, এতেই রয়েছে রিযিকের দশটি অংশের মধ্যে নয়টি। বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আঃ) এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি কাজ কর? সে বলল ঃ আল্লাহ তা'আলার এবাদত করি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার ভরণ-পোষণ কে করে? সে বলল ঃ আমার এক ভাই। তিনি বললেন ঃ তোমার ভাই তোমার চেয়ে বেশী এবাদতকারী। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আমার জানা মতে তোমাদেরকে যেসব কাজ জান্নাতের নিকটবর্তী এবং দোযখ থেকে দূরবর্তী করে দেয়, সেগুলো সম্পাদনের আদেশ আমি তোমাদেরকে না দিয়ে ছাড়িনি। পক্ষান্তরে আমার জানা মতে, যেসব কাজ তোমাদেরকে জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে দোযখের নিকটবর্তী করে, সেগুলো থেকে নিষেধ করতেও আমি কসুর করিনি। জিবরাঈল (আঃ) আমার মনে একথা জাগিয়ে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি বিলম্বে হলেও তার রিযিক পুরোপুরি লাভ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না; অতএব তোমরা

আল্লাহকে ভয় কর এবং উত্তম পন্থায় রিযিক অন্বেষণ কর। এ হাদীসে উত্তম পন্থায় রিযিক অন্বেষণ করতে বলা হয়েছে। একথা বলা হয়নি যে, রিযিক অন্বেষণ করো না। হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে, বিলম্বে রিযিক প্রাপ্তি যেন আল্লাহর অবাধ্য হয়ে রিযিক অন্বেষণ করার কারণ না হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ তা'আলার কাছে যা আছে, তা তার অবাধ্যতার মাধ্যমে পাওয়া যায় না। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ বাজার আল্লাহ তা'আলার দস্তরখান। যেব্যক্তি এখানে আসবে, সে কিছু না কিছু নেবে। আরও বলা হয়েছে ঃ খড়ির বোঝা পিঠে বহন করে জীবিকা উপার্জন করা কোন ধনী ব্যক্তির কাছে হাত পাতা অপেক্ষা উত্তম; ধনী ব্যক্তি কিছু দান করুক বা না করুক। অন্য এক হাদীসে আছে-

من فتح على نفسه بابا من السوال فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر -

অর্থাৎ, যেব্যক্তি নিজের সামনে সওয়ালের একটি দ্বার উন্মুক্ত করে, আল্লাহ তার সামনে দারিদ্র্যের সত্তরটি দ্বার উন্মুক্ত করে দেন।

এ সম্পর্কে বুযুর্গগণের উক্তি এই ঃ লোকমান হাকীম তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ বৎস, হালাল উপার্জন দ্বারা নিঃস্বতা দূর করবে। কেননা, যে ফকীর হয়ে যায়, তার মধ্যে তিনটি বিষয় সৃষ্টি হয়-(এক) দ্বীনদারীতে তরলতা, (দুই) জ্ঞানবুদ্ধির দুর্বলতা এবং (তিন) ভদ্রতার অবসান। এই তিনটি বিষয়ের চেয়েও মারাত্মক হল মানুষ তাকে ঘৃণা করে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রিযিক অন্বেষণ থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকা এবং আল্লাহ আমাকে রিযিক দাও বলা উচিত নয়। কেননা, তুমি জান, আসমান থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য বর্ষিত হয় না। যায়েদ ইবনে সালামা নিজের ক্ষেতে বৃক্ষ রোপণ করছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে দেখে বললেন ঃ তুমি চমৎকার কাজ করছ। মানুষের কাছ থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাওয়া উচিত। এতে তোমার দ্বীনদারী অধিক সংরক্ষিত থাকবে এবং এভাবেই তুমি মানুষের প্রতি অধিক কৃপা করতে পারবে। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ যখন কাউকে দেখি সে বেকার- দুনিয়ার কাজও করে না এবং দ্বীনের কাজও করে না, তখন আমার খুবই খারাপ লাগে।

হযরত ইবরাহীম নখয়ীকে কেউ প্রশ্ন করল ঃ বলুন, সাধু ব্যবসায়ী আপনার অধিক পছন্দনীয়, না সেই ব্যক্তি, যে এবাদতের জন্যে মুক্ত হয়ে আছে? তিনি বললেন ঃ আমি সাধু ব্যবসায়ীকে অধিক ভালবাসি। কেননা, সে জেহাদে লিপ্ত রয়েছে। শয়তান তাকে কখনও মাপে, কখনও ওজনে, কখনও গ্রহণে এবং কখনও প্রদানে ধোঁকা দিতে চায়। সে শয়তানের সাথে লড়াই করে। তার আনুগত্য করে না। এ ক্ষেত্রে হযরত হাসান বসরীর বিচার বিপরীত। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি বাজারে যাওয়া ও পরিবারের জন্যে ক্রয়-বিক্রয় করার জায়গা ছাড়া অন্য কোন জায়গায় মৃত্যুবরণ করা আনন্দদায়ক মনে করি না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার পশুপক্ষীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

تغدوا خماصا وتروح بطانا

অর্থাৎ, পাখীরা সকাল বেলায় ক্ষুধার্ত উঠে এবং সন্ধ্যায় পেট ভরে নেয়। উদ্দেশ্য, রিযিকের অন্বেষণে পাখীরাও সকাল বেলায় এদিক ওদিক বেরিয়ে যায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীগণ স্থলপথে ও নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন এবং খেজুর বাগানের পরিচর্যা করতেন। তাঁদের অনুসরণ যথেষ্ট। আবু কালাবা (রহঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ আমি যদি তোমাকে জীবিকা উপার্জনে নিয়োজিত দেখি, তবে তা মসজিদের কোণে বসে থাকতে দেখার চেয়ে উত্তম। আওযায়ী হযরত ইবরাহীম আদহামের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখেন, তাঁর মাথায় খড়ির বোঝা। তিনি বললেন ঃ হে আবু ইসহাক, এত পরিশ্রম করেন কেন? আপনার খেদমতের জন্যে তো আপনার ভাই-ই যথেষ্ট। হযরত ইবরাহীম আদহাম জওয়াব দিলেন ঃ হে আবু আমর, আমার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলো না। আমি শুনেছি, যেব্যক্তি হালাল অন্বেষণে কোন অপমানের জায়গায় দাঁড়ায়, তার জন্যে জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায়। আবু সোলায়মান দারানী (রহঃ) বলেন ঃ তুমি হাত, পা গুটিয়ে রাখবে এবং অন্য ব্যক্তি তোমাকে খাওয়াবে, আমাদের মতে এর নাম এবাদত নয়; বরং প্রথমে দু'রুটির চিন্তা কর, এর পর এবাদত কর। মোট কথা, এ পর্যন্ত শরীয়তমতে হাত পাতার নিন্দা এবং অপরের খেদমতের উপর ভরসা করার অনিষ্ট বর্ণিত হল।

যেব্যক্তির কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ নেই, উপার্জন করা ও ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া তার কোন গতি নেই। এখন কিছু বিপরীত উক্তি শুনা দরকার। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমার প্রতি আল্লাহ তা'আলা এই আদেশ করেননি যে, আমি ধন দৌলত সঞ্চয় করি এবং একজন ব্যবসায়ী হয়ে যাই; বরং আমার প্রতি এই প্রত্যাদেশ হয়েছে–

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ -

অর্থাৎ, আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন, সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান এবং মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত নিজ পালনকর্তার এবাদত করুন।

অনুরূপভাবে হযরত সালমান ফারেসীকে কেউ বলল ঃ আপনি আমাকে অন্তিম উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ হজ্জ অথবা পালনকর্তার মসজিদ নির্মাণ করা অবস্থায় তোমাদের কারও মৃত্যু হোক বা না হোক, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা মানুষের কাছ থেকে দলীলের টাকা নেয়া অবস্থায় যাতে কারও মৃত্যু না হয়, সেজন্যে তওবা করা দরকার।

এই বৈপরীত্যের জওয়াব, এসব হাদীসের সমন্বয় সাধন অবস্থার বিস্তারিত আলোচনার উপর নির্ভরশীল। আমরা একথা বলি না যে, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছু থেকে সর্বাবস্থায় উত্তম; বরং আমাদের উদ্দেশ্য প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-সম্পদের ভান্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করা মন্দ। কেননা, এতে দুনিয়ার দিকে সর্বতোভাবে মনোনিবেশ করতে হয়, যার মোহ যাবতীয় গোনাহের মূল। এর সাথে যদি মানুষের কাছ থেকে করও আদায় করা হয়, তবে তা জুলুম ও পাপাচারের অন্তর্ভুক্ত। হযরত সালমান ফারেসীর উক্তিতে এ ধরনের বাণিজ্যই উদ্দেশ্য, কিন্তু নিজের ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণে যথেষ্ট হয়– এই পরিমাণ ধন দৌলত পাওয়ার লক্ষ্যে ব্যবসা করলে তা হাত পাতা অপেক্ষা উত্তম। চার ব্যক্তির জন্যে কোন পেশা না করা উত্তম। প্রথম, যেব্যক্তি শারীরিক এবাদতে আবেদ। দ্বিতীয়, যেব্যক্তি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে এবং এলমে হাল ও এলমে কাশফে অন্তরের আমল অর্জন করেছে। তৃতীয়, যে বাহ্যিক

আলেম মানুষের দ্বীনদারীতে সহায়ক কাজকর্মে মশগুল; যেমন মুফতী, মুফাসসির ও মোহাদ্দেস। চতুর্থ, যেব্যক্তি মানুষের জাগতিক কল্যাণ সাধনে ব্যাপৃত এবং তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়াদির দায়িত্বে নিয়োজিত; যেমন শাসনকর্তা, বিচারপতি প্রমুখ। এই চার প্রকার লোকের জন্যে উপার্জনে মশগুল হওয়ার তুলনায় নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাওয়া উত্তম। তারা বায়তুল মাল থেকে নয়; বরং আলেম ও ফকীহদের জন্যে ওয়াকফকৃত তহবিল থেকে নিজেদের ভরণ-পোষণ নেবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মধ্যে উপরোক্ত চারটি গুণ আরও অনেক বর্ণনাতীত গুণসহ বিদ্যমান ছিল। তাই তাঁকে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করার এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আদেশ করা হয়েছে– ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আদেশ করা হয়নি। এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন, তখন সহচরগণ তাঁকে ব্যবসা ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দিলেন। কেননা, ব্যবসা করলে মুসলমানদের কাজ করার মত অবসর পাওয়া যেত না। তাই তিনি বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজন পরিমাণে অর্থ নিতেন। পরে ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি ওসিয়ত করেন, যে পরিমাণ অর্থ তিনি নিয়েছেন সেই পরিমাণ অর্থ যেন বায়তুল মালে ফেরত দেয়া হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

এই পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তুগুলো জানা যে কোন উপার্জনশীল মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। কেননা, হাদীসে যে বলা হয়েছে– জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয, এর উদ্দেশ্যও সেই জ্ঞান, যার প্রয়োজন পড়ে। তাই যেব্যক্তি এ পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু জ্ঞাত হবে, সে যেসব বিষয় ব্যবসা-বাণিজ্য ফাসেদ করে দেয়, সেগুলো জানতে পারবে এবং আদান-প্রদানে সেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। যদি কোন খুঁটিনাটি দুরূহ বিষয় সামনে আসে, তবে জিজ্ঞেস করে না জানা পর্যন্ত সেই বিষয় থেকে বিরত থাকতে পারবে। কেননা, ফাসেদকারী কারণসমূহ সংক্ষেপে না জানলে সে কিরূপে বুঝবে যে, বিরত থাকা ও জিজ্ঞেস করা কখন ওয়াজিব? যদি কোন আদান-প্রদানকারী বলে যে, সে প্রথমে জ্ঞান অর্জন করবে না; বরং আপন কাজ করে যাবে এবং যখন কোন দুরূহ ব্যাপার সামনে আসবে, তখনই তার মাসআলা জিজ্ঞেস করে নেবে, তবে এ ব্যক্তিকে জওয়াব দেয়া হবে যে, যখন তুমি ফাসেদকারী বিষয়সমূহ সংক্ষেপে জানবে না, তখন কিরূপে বুঝবে, এ বিষয়টি জিজ্ঞাসা করার যোগ্য? তুমি তো শুদ্ধ ও বৈধ মনে করেই আদান-প্রদান করে যাবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাও হবে অবৈধ। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বাজারে ঘুরাফেরা করতেন এবং কোন কোন ব্যবসায়ীকে চাবুক মেরে বলতেন ঃ আমাদের বাজারসমূহে তারাই ক্রয়-বিক্রয় করবে, যারা মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবে। অন্যথায় জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে সুদ খেয়ে বসবে। নিম্নে বিভিন্ন ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ আমরা আলাদাভাবে তুলে ধরেছি।

হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রথম রোকন–ক্রেতা-বিক্রেতা ঃ এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর উচিত চার ব্যক্তির সাথে ক্রয়বিক্রয় না করা। প্রথম বালক, দ্বিতীয় উন্মাদ, তৃতীয় গোলাম এবং চতুর্থ অন্ধ। কেননা, বালক ও উন্মাদ শরীয়তে মুকাল্লাফ নয়। অর্থাৎ, তারা শরীয়তের বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত। বালককে যদি তার ওলী ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেয়, তবুও তার

ক্রয়-বিক্রয় ইমাম শাফেয়ীর মতে জায়েয নয়। বালক ও উন্মাদের হাতে কেউ নিজের কোন বস্তু দিলে তা যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তা দাতারই বিনষ্ট হবে। বালক ও উন্মাদ তার ক্ষতিপূরণ দেবে না। অন্ধ অদৃশ্য বস্তুর ক্রয়বিক্রয় করবে, তাই তার সাথে ক্রয়বিক্রয় জায়েয নয়। অন্ধ যদি কাউকে উকিল নিযুক্ত করে, তবে উকিলের সাথে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। কাফেরের সাথে ক্রয়বিক্রয় জায়েয; কিন্তু তার কাছে কোরআন শরীফ বিক্রয় করা উচিত নয়। যুদ্ধাবস্থায় কাফেরের কাছে অস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। বিক্রয় করলে তা অগ্রাহ্য হবে এবং বিক্রেতা আল্লাহর কাছে গোনাহগার হবে।

দ্বিতীয় রোকন- পণ্যবস্তু ঃ অর্থাৎ, সেই বস্তু, যা একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে যায়, তা পণ্যবস্তু হোক অথবা তার মূল্য। এতে ছয়টি শর্ত নির্ধারিত রয়েছে। প্রথম শর্ত, পণ্যদ্রব্য সত্তার দিক দিয়ে নাপাক হতে পারবে না । নাপাক বস্তুর ক্রয়বিক্রয় জায়েয নয়। উদাহরণতঃ কুকুর, শূকর, গোবর, পায়খানা, হাতীর দাঁত ও তা দ্বারা নির্মিত পাত্র ক্রয়বিক্রয় করা জায়েয নয়। কারণ মৃত্যুর কারণে হাড় নাপাক হয়ে যায়। হাতীকে জবাই করলেও পাক হয় না। এছাড়া মদ ক্রয়বিক্রয় করা এবং যেসব জন্তু খাওয়া জায়েয নয়, সেগুলোর চর্বি ক্রয়বিক্রয় করাও জায়েয নয়, যদিও এর দ্বারা বাতি জ্বালানো ও নৌকায় মালিশ করার উপকার পাওয়া যায়। পাক তেল নাপাকী পড়ার কারণে নাপাক হয়ে গেলে তা ক্রয়বিক্রয় করা জায়েয। কেননা, খাওয়া ছাড়া এটা অন্য উপকারে আসতে পারে এবং সত্তাগতভাবে নাপাক নয়– বরং বাইরের নাপাকী দ্বারা নাপাক হয়েছে। অনুরূপভাবে রেশম পোকার ডিম ক্রয়বিক্রয় করার মধ্যে আমার মতে কোন দোষ নেই। কারণ, এটা প্রাণীর মূল, যা উপকারী। মৃগনাভি ক্রয়বিক্রয় করা জায়েয। হরিণের জীবদ্দশায় এটা নাভি থেকে আহরণ করা হলে এটাকে পাক বলাই উচিত।

দ্বিতীয় শর্ত, পণ্যদ্রব্য উপকারী হতে হবে। এ থেকে বুঝা যায়, কীটপতঙ্গ, ইঁদুর ও সর্পের ক্রয়বিক্রয় অবৈধ। সাপ দ্বারা সাপুড়েদের যে উপকার হয়, তা ধর্তব্য নয়। বিড়াল, মৌমাছি, চিতা বাঘ, সিংহ এবং শিকারী জন্তু অথবা যেগুলোর চামড়া কাজে লাগে, সেগুলোর ক্রয়বিক্রয় জায়েয। বোঝা বহনের উদ্দেশে হাতীর ক্রয়বিক্রয়ও জায়েয। তোতা পাখী, ময়ূর ও সুশ্রী বর্ণযুক্ত জন্তুর ক্রয় বিক্রয় জায়েয। এগুলো খাওয়ার কাজে না এলেও এগুলোর সুমধুর কণ্ঠস্বর দ্বারা চিত্তবিনোদন একটি বৈধ উদ্দেশ্য। কুকুর দেখতে সুশ্রী হলেও তা ক্রয়বিক্রয় উচিত নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কুকুর ক্রয়বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। বাঁশী, সারঙ্গী, বীণা ও তারের বাদ্যযন্ত্র ক্রয়বিক্রয় জায়েয নয়। কেননা, এতে শরীয়তসম্মত কোন উপকারিতা নেই। এমনিভাবে মেলায় যে সমস্ত মাটির খেলনা ও পুতুল বিক্রয় হয়, সেগুলো ক্রয় করা বৈধ নয়; বরং শরীয়ত অনুযায়ী এগুলো ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব। জন্তু-জানোয়ারের ছবি অংকিত কাপড় বিক্রয় করা জায়েয; কিন্তু এগুলো পেতে রাখা অবস্থায় ব্যবহার করতে হবে– ঝুলানো অবস্থায় নয়। এ ধরনের একটি পর্দার কাপড় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আয়েশাকে বলেছিলেন ঃ এটা বিছানা বানিয়ে নাও।

তৃতীয় শর্ত, যে জিনিস বিক্রয় হবে, তা বিক্রেতার মালিকাধীন থাকতে হবে অথবা মালিকের অনুমতিক্রমে বিক্রয় হতে হবে। সুতরাং মালিক নয়– এমন ব্যক্তির কাছ থেকে মালিকের অনুমতি আশা করে কোন জিনিস কিনলে তা বৈধ হবে না। পরে যদি মালিক সম্মতও হয়ে যায়, তবুও নতুনভাবে ক্রয় করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে পরে জানতে পারলে সম্মত হয়ে যাবে– এই আশায় স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামীর জিনিস ক্রয় করা অথবা স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীর জিনিস ক্রয় করা অথবা পিতার কাছ থেকে পুত্রের জিনিস ক্রয় করা ইত্যাদি শুদ্ধ হবে না। কেননা, মালিকের সম্মতি ক্রয়ের পূর্বে থাকতে হবে। বাজারসমূহে এ ধরনের কেনাবেচা হয়। দ্বীনদারদের উচিত এ ধরনের কেনাবেচা থেকে বেঁচে থাকা।

চতুর্থ শর্ত, বিক্রয়ের জিনিসটি যেন এমন হয় যে, তা শরীয়তসম্মতভাবে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে সমর্পণ করা যায়। এরূপ না হলে তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। যেমন– পলাতক গোলাম, পানির ভিতরকার মাছ, গর্ভস্থ বাচ্চা এবং জন্তুর পিঠের লোম বিক্রয় করা। অনুরূপভাবে স্তনের ভিতরকার দুগ্ধ বিক্রয় করা জায়েয নয়। কেননা, এগুলো ক্রেতাকে সমর্পণ করা কঠিন। এমনিভাবে বাচ্চা ছোট হলে তাকে রেখে তার মাকে বিক্রয় করা শুদ্ধ নয়, যেমন মাকে রেখে এরূপ বাচ্চা

বিক্রয় করাও দুরস্ত নয়। কেননা, এখানে বিক্রীত বস্তু ক্রেতার কাছে সমর্পণ করলে বাচ্চা তার মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বাচ্চাকে তার মা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হারাম।

পঞ্চম শর্ত, বিক্রয়ের জিনিস নির্দিষ্ট থাকতে হবে এবং পরিমাণ ও গুণ জানা থাকতে হবে। এ থেকে জানা গেল, যদি বিক্রেতা বলে, এই ছাগল অথবা সম্মুখের এই থানগুলো থেকে যে কোন একটি থান অথবা থানের যেদিক থেকে ইচ্ছা এক গজ কাপড় অথবা এই যমীন থেকে যেদিক ইচ্ছা দশ গজ যমীন বিক্রয় করলাম, তবে এই বিক্রয় বাতিল গণ্য হবে। ধর্মীয় ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শনকারীরা এ ধরনের ক্রয়বিক্রয়ে অভ্যস্ত হয়ে থাকে। পরিমাণ জানার ব্যাপারে চোখে দেখে অনুমান করা যথেষ্ট। আর জিনিস দেখে তার গুণ জানা যায়। সুতরাং অনুপস্থিত জিনিস বিক্রি করা জায়েয হবে না। হাঁ, যদি পূর্বে দেখে থাকে এবং দেখার পর এতদিন অতিবাহিত হয়েছে যাতে সাধারণতঃ পরিবর্তন হয় না, তবে বিক্রয় জায়েয হবে।

ষষ্ঠ শর্ত, বিনিময়ের দিক দিয়ে বিক্রেতা যে জিনিসের মালিক, বিক্রয়ের পূর্বে তা তার দখলে এসে যাওয়া উচিত। বিক্রেতার দখলে আসেনি, এমন জিনিস বিক্রয় করতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিষেধ করেছেন। এ ক্ষেত্রে স্থাবর অস্থাবর সকল বস্তু সমান। অস্থাবর জিনিসের দখল তুলে নেয়ার মাধ্যমে হয় এবং যমীন তথা স্থাবর জিনিসের দখল অন্যের কোন কিছু তাতে না থাকা এবং অন্যের ক্ষমতা বিলুপ্ত হওয়ার মাধ্যমে হয়।

হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের তৃতীয় রোকন- প্রস্তাব গ্রহণ ঃ এ ক্ষেত্রে প্রস্তাব ও তার সাথে সাথেই উদ্দেশ্যজ্ঞাপক ভাষায় তা গ্রহণ হওয়া জরুরী। এ প্রস্তাব ও গ্রহণ পরিষ্কার ভাষায় হতে হবে; যেমন বিক্রেতা বলবে- আমি এ বস্তু তোমার কাছে এত টাকায় বিক্রয় করলাম। ক্রেতা বলবে- আমি গ্রহণ করলাম। অথবা ইঙ্গিতে বলবে- যেমন বিক্রেতা বলবে, আমি তোমাকে এই জিনিস এত টাকার বদলে দিলাম এবং ক্রেতা বলবে, আমি গ্রহণ করলাম। একথা বলে উভয়ের উদ্দেশ্য ক্রয়বিক্রয়ই হবে; কিন্তু কোন মহিলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে বাগদানের সম্ভাবনাও হতে পারে। নিয়ত করলে সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। আর পরিষ্কার ভাষায় বললে কোন বিবাদই থাকে না।

কেনাবেচায় চুক্তির চাহিদার খেলাফ কোন শর্ত সংযোজন করা বৈধ নয়। উদাহরণতঃ কিছু বেশী দেয়ার শর্তে অথবা পণ্যদ্রব্য বাড়ী পৌঁছে দেয়ার শর্তে কেনাবেচার চুক্তি করলে তা জায়েয হবে না। হাঁ, পণ্যদ্রব্য বাড়ী পৌঁছানোর মজুরি পৃথকভাবে নির্ধারণ করে দিলে তা জায়েয হবে। যদি বিক্রেতা ও ক্রেতা প্রস্তাব এবং গ্রহণের বাক্য মুখে উচ্চারণ না করে কেবল আদান-প্রদান করে নেয়, তবে এ ধরনের কেনাবেচা ইমাম শাফেয়ীর মতে সিদ্ধ নয়। ইমাম আবু হানীফার মতে মামুলী পণ্যসামগ্রীর বেলায় তা জায়েয। কেননা, এরূপ কেনাবেচা সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইবনে শুরায়হ এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার উক্তি অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন। বাস্তবে এ উক্তিই সমতার অধিকতর নিকটবর্তী। কারণ, এর প্রয়োজন আছে এবং মানুষের মধ্যে এর প্রচলন বেশী। এতদত্ত্বেও প্রস্তাব ও গ্রহণ বর্জন না করাই খোদাভীরু দ্বীনদারদের উচিত।

সুদের লেনদেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সুদ হারাম করেছেন এবং এ ব্যাপারে কঠোর নীতি ব্যক্ত করেছেন। অতএব যারা সোনারূপার লেনদেন করে, অথবা খাদ্য শস্যের ব্যবসা করে, তাদের উপর সুদ থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। কারণ সুদ দু'জিনিসেই হয়- সোনারূপা এবং খাদ্য শস্যে। সোনারূপার ব্যবসায়ীদেরকে বাকী দেয়া ও কমবেশী দেয়া থেকে বেঁচে থাকতে হবে। বাকী দেয়া থেকে বেঁচে থাকার অর্থ, সোনারূপার যে বস্তু সোনারূপার অন্য যে বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করবে, তা হাতে হাতে হওয়া দরকার; অর্থাৎ বিক্রেতা মূল্য এবং ক্রেতা পণ্য সামগ্রী একই মজলিসে হস্তগত করবে। বিক্রেতা নিজের প্রাপ্য আজ নেবে এবং ক্রেতাকে তার প্রাপ্য কাল অথবা কিছুক্ষণ পরে সমর্পণ করবে- এটা যেন না হয়। সুতরাং পোদ্দার যদি সোনা অথবা রূপা টাকশালে আজ জমা দেয় এবং তার বিনিময়ে আশরফী অথবা টাকা আগামীকাল গ্রহণ করে, তবে এই ক্রয়বিক্রয় হারাম হয়ে যাবে। এটা হারাম এ কারণেও যে, এতে পণ্য ও তার মূল্য সমান সমান হয় না। কেননা, টাকশালে সোনারূপার ওজন মুদ্রার ছাপ লাগার পর তা থাকে না, যা পূর্বে ছিল। কম বেশী থেকে বেঁচে থাকার অর্থ হচ্ছে, তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকবে- প্রথম, মুদ্রার খন্ড অংশ পূর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করবে না। উভয়টি এক রকম না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি জায়েয হবে না। দ্বিতীয়,

খাঁটিকে কৃত্রিমের বদলে বিক্রয় করবে না যদি উভয়ের ওজনে পার্থক্য হয়। যে মুদ্রার ওজন কম, কিন্তু মাল খাঁটি, সেটিকে এমন মুদ্রার সাথে বদলাবে, যার মাল কৃত্রিম, কিন্তু ওজন বেশী। এ উভয় লেনদেন তখন নাজায়েয, যখন রূপা রূপার বিনিময়ে এবং সোনা সোনার বিনিময়ে বিক্রয় করা হয়। অপরপক্ষে সোনার বিনিময়ে রূপা কিংবা রূপার বিনিময়ে সোনা বিক্রয় করা হলে কমবেশী হওয়া জায়েয। সোনা ও রূপার সংমিশ্রণে গঠিত আশরফীর মধ্যে সোনার পরিমাণ অজানা থাকলে তার লেনদেন জায়েয হবে না। হাঁ, এরূপ মুদ্রা শহরে প্রচলিত থাকলে আমরা তার লেনদেন জায়েয বলব, যদি প্রচলিত মুদ্রার বিনিময়ে লেনদেন না হয়। তাম্র মিশ্রিত টাকার অবস্থাও তদ্রূপ। কেননা, এগুলোর উদ্দেশ্য রূপা, যার পরিমাণ জানা নেই। শহরে প্রচলিত থাকলে এগুলোর লেনদেনও জায়েয। কেননা, তখন উদ্দেশ্য রূপা নয়। তবে রূপার বিনিময়ে এগুলোর লেনদেন না হওয়া উচিত। স্বর্ণ ও রৌপ্যের সংমিশ্রণে গঠিত অলংকার স্বর্ণের বা রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করা বৈধ নয়। এগুলো স্বর্ণের পরিমাণ জানা থাকলে আসবাবপত্রের বিনিময়ে ক্রয় করা উচিত। যদি অলংকারের উপর স্বর্ণের গিল্টি এমনভাবে করা হয় যে, আগুনে রেখে সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না, তবে এরূপ অলংকার রূপার বিনিময়ে অথবা সোনা রূপার কোন বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করা জায়েয। এখন খাদ্যদ্রব্য ব্যবসায়ীদের স্মরণ রাখা উচিত, এক জাতীয় খাদ্যদ্রব্য যদি বিক্রয়ের সামগ্রীও হয় এবং মূল্যও হয় অথবা শুধু বিক্রয়ের সামগ্রী হয় কিংবা শুধু মূল্য হয়, তবে একই মজলিসে পারস্পরিক হস্তান্তর হতে হবে। উদাহরণতঃ গমের বিনিময়ে গম বিক্রয় করলে এক হাতে দেবে এবং অন্য হাতে নেবে। বিক্রয়ের সামগ্রী এবং মূল্য এক জাতীয় হলে অর্থাৎ গমের বদলে গম বিক্রয় করলে উভয়টি সমান হওয়াও জরুরী। এ ক্ষেত্রে অনেক নাজায়েয লেনদেন মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। উদাহরণতঃ মানুষ কসাইকে জীবিত ছাগল দেয় এবং এর বিনিময়ে গোশত নগদ অথবা বাকী নেয়। এটাও হারাম। অথবা কলুকে নারকেল, তিল, জাফরান, সরিষা ইত্যাদি দিয়ে এগুলোর বিনিময়ে নগদ অথবা বাকী তেল নেয়। এগুলো সবই হারাম। যে জিনিস দ্বারা কোন খাদ্য-বস্তু তৈরী হয়, সেই জিনিসের বিনিময়ে সেই খাদ্যবস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা নাজায়েয– ওজনে সমান হোক কিংবা কম বেশী হোক। উদাহরণতঃ গমের বিনিময়ে রুটি ও ছাতু ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না।

খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বিক্রয়ের বস্তু ও মূল্য সমান সমান হলে তখন সুদ হবে না, যখন সেই খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয়যোগ্য হয়, অর্থাৎ কাঁচামাল না হয়। আর যদি সঞ্চয়যোগ্য না হয় অর্থাৎ এক অবস্থায় না থাকে, তবে সমান সমান বিক্রয় করলেও সুদ হবে। এ কারণেই কাঁচা খোরমার বিক্রয় কাঁচা খোরমার বিনিময়ে এবং আঙ্গুরের বিক্রয় আঙ্গুরের বিনিময়ে জায়েয নয়– সমান সমান হোক কিংবা কমবেশী। (সুদ সম্পর্কিত উপরোক্ত বক্তব্য শাফেয়ী মাযহাবের ভিত্তিতে রাখা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের বক্তব্য কিছুটা ভিন্ন ধরনের, যা হানাফী মযহাবের কিতাবসমূহে দেখা যেতে পারে।) ব্যবসায়ীদেরকে ক্রয়-বিক্রয়ের সংজ্ঞা ও অনিষ্টের স্থান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করার ব্যাপারে উল্লেখিত কয়েকটি বিষয়ে সন্দেহ হলে অথবা কোন বিষয় বোধগম্য না হলে তাদের জিজ্ঞেস করে নেয়া উচিত। যদি এতটুকু বিষয়ও জানা না থাকে, তবে কোথায় জিজ্ঞেস করত হবে, সে সম্পর্কেও তারা অজ্ঞ থাকবে এবং অজ্ঞাতে সুদ ও হারাম লেনদেনে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

বায়ে-সলম বা অগ্রিম ক্রয়বিক্রয়ের দশটি শর্ত ঃ (১) অগ্রিম দেয় পুঁজি নির্দিষ্ট ও জানা থাকা, যাতে অপর পক্ষ বিনিময়ে বস্তু দিতে সক্ষম না হলে পুঁজিওয়ালা তার পুঁজি ফেরত নিতে পারে। সুতরাং পুঁজিওয়ালা যদি এক থলে ভর্তি টাকা অনুমান করে এই বলে দিয়ে দেয় যে, এর বিনিময়ে এই পরিমাণ গম নেবে, তবে এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই বিনিময় জায়েয হবে না। (২) চুক্তির মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে মজলিসের মধ্যেই পুঁজি সমর্পণ করতে হবে। অপরপক্ষ পুঁজি হস্তগত নাকরে মজলিস থেকে আলাদা হয়ে গেলে বিনিময় জায়েয হবে না। (৩) যে বস্তু অগ্রিম ক্রয় করা হয়, তা এমন হতে হবে, যার গুণ বর্ণনা করা যায়; যেমন খাদ্য শস্য, জন্তু-জানোয়ার, খনিজ দ্রব্য, তুলা, পশম, দুধ, মাংস ইত্যাদি। (৪) যেসব বস্তু গুণগত মান বর্ণনা করা যায়, সেগুলোর গুণগত মান বর্ণনা করতে হবে, এমন কি কোন গুণ যেন অবশিষ্ট থেকে না যায়, যার কারণে বস্তুর মূল্য অসহনীয় পর্যায়ে নেমে যায়। কেননা, এরূপ গুণগত মান বর্ণনা করা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দেখে নেয়ার স্থলবর্তী হয়ে থাকে। (৫) মেয়াদের উপর অগ্রিম ক্রয় করা হলে মেয়াদ সুনির্দিষ্ট হতে হবে। এরূপ বলা চলবে না যে, ফসল কাটা পর্যন্ত অথবা ফল পাকা পর্যন্ত অগ্রিম ক্রয় করছি; বরং মাস ও দিনের হিসাবে মেয়াদ নির্দিষ্ট

করতে হবে। কারণ, ফসল কাটা এবং ফল পাকা আগে পিছে হতে পারে। (৬) ক্রীত বস্তু এমন হতে হবে, যা মানুষ প্রতিশ্রুত সময়ে দিতে পারে এবং বিলুপ্ত না হওয়ার প্রবল ধারণা থাকে। যদি কোন স্বাভাবিক আপদের কারণে জিনিসটি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং প্রতিশ্রুত মেয়াদে সমর্পণ করা সম্ভব না হয়, তবে পুঁজিদাতা ইচ্ছা করলে প্রয়োজনীয় সময় দেবে এবং ইচ্ছা করলে লেনদেন বাতিল করে নিজের পুঁজি প্রত্যাহার করে নেবে। (৭) যদি সমর্পণ করার স্থান পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে জিনিষটি সমর্পণ করার স্থান চুক্তিতে উল্লেখ করতে হবে, যাতে পরবর্তীতে কলহ সৃষ্টি না হয়। (৮) ক্রীত বস্তুকে অন্য কোন নির্দিষ্ট বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা যাবে না। উদাহরণতঃ এরূপ বলা যাবে না যে, এই ক্ষেতের গম অথবা এই বাগানের ফল নেব। কেননা, এরূপ শর্তের কারণে ক্রীত বস্তু যে ঋণ, তা বাতিল হয়ে যায়। তবে যদি অমুক শহরের ফল বলা হয়, তবে কোন ক্ষতি নেই এবং সেই শহরের ফলই দিতে হবে। (৯) ক্রীত বস্তু দুর্লভ না হওয়া চাই। উদাহরণতঃ মোতির এমন গুণ উল্লেখ করা, যা খুবই বিরল। (১০) মূল্য বা পুঁজি খাদ্য জাতীয় বস্তু হলে ক্রীত বস্তুটি খাদ্য জাতীয় না হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে পুঁজি সোনা-রূপা হলে ক্রয়ের জিনিস সোনা-রূপা না হওয়া উচিত। সুদের বর্ণনায় আমরা এ বিষয়টি বর্ণনা করেছি।

ইজারা বা ভাড়ায় ক্রয় ঃ এতে প্রথম বিষয় ভাড়া এবং দ্বিতীয় বিষয় ইজারাদারের মুনাফা। এখানে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বর্ণিত ভাষাই ধর্তব্য হবে। ইজারার মধ্যে ভাড়া ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্যের অনুরূপ। তাই যেসব শর্ত আমরা মূল্যের ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করে এসেছি, ভাড়ার বেলায়ও সেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা দরকার। এক্ষেত্রে মানুষ যেসব বিষয়ে অভ্যস্ত, শরীয়তে সেগুলোর কোন মূল্য নেই। উদাহরণতঃ নির্মাণের বিনিময়ে গৃহ ইজারা দেয়া হয় এবং নির্মাণের পরিমাণ জানা থাকে না। যদি ভাড়ার টাকা নির্দিষ্ট করে ভাড়াটের সাথে শর্ত করা হয় যে, এই টাকা নির্মাণে নিয়োজিত করবে, তবে তা জায়েয হবে না। কেননা, নির্মাণে নিয়োজিত করার কাজটি অজানা। যদি জন্তুর চামড়া ছিলিয়ে নেয় এবং চামড়াকে মজুরি নির্দিষ্ট করে অথবা আটা পিষিয়ে তার ভূষিকে মজুরি নির্দিষ্ট করে, তবে এই ইজারা বাতিল হবে। মোট কথা, মজুরি ও ইজারাদারের কর্ম দ্বারা যা অর্জিত হয়, তাকে মজুরি ও ভাড়া সাব্যস্ত করা

বাতিল। যদি দোকান ও গৃহের ভাড়ার ক্ষেত্রে অনেক দিনের ভাড়া একত্রিত করে বলে দেয় যে, প্রতি মাসের ভাড়া এক দীনার, এর পর কত মাস তা বর্ণনা না করে, তবে মেয়াদ অজ্ঞাত থাকার কারণে ইজারা জায়েয হবে না।

ইজারার দ্বিতীয় রোকন হল, সেই মুনাফা, যা ইজারার উদ্দেশ্য এবং তা হল কেবল কর্ম। বৈধ, নির্দিষ্ট ও শ্রমসাধ্য কর্মের জন্যে ইজারা জায়েয। ইজারার কেবল শাখা-প্রশাখা এই সামগ্রিক নীতির অধীন। ফেকাহ গ্রন্থসমূহে আমরা এসব শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। এ গ্রন্থে কেবল সেসব বিষয় বর্ণনা করব, যা প্রায়ই কাজে লাগে। সুতরাং যে কর্মের জন্যে ইজারা ও ঠিকা হয়, তাতে পাঁচটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথম, সেই কর্ম কিছু কষ্ট ও শ্রমসাধ্য হতে হবে। এ থেকে বুঝা যায়, দোকান সাজানোর জন্যে খাদ্যবস্তু ইজারা নেয়া জায়েয নয়। দ্বিতীয়, মুনাফা ছাড়া কোন উদ্দিষ্ট বস্তু যেন ইজারাদারের মালিকানায় চলে না যায়। উদাহরণতঃ ইজারাদার এ উদ্দেশে আঙ্গুর বৃক্ষ ইজারা নিল যে, তা থেকে উৎপন্ন আঙ্গুর সে নেবে অথবা দুধ পাওয়ার আশায় গাভী ইজারা নেয়া। এ ধরনের ইজারা বৈধ নয়, কিন্তু শিশুকে বুকের দুধ পান করানোর জন্যে কোন মহিলাকে মজুরির বিনিময়ে নিযুক্ত করা জায়েয। এ অবস্থায় দুধ আলাদা করা যায় না বিধায় দুধ মহিলার অনুগামী হয়ে যাবে। এটা আলাদাভাবে উদ্দিষ্টও হয় না। তৃতীয়, কর্মটি এমন হতে হবে, যা মজুর বাহ্যতঃ ও শরীয়ত অনুযায়ী মালিককে দিতে পারে। সুতরাং যদি কোন দুর্বল ব্যক্তিকে এমন কাজের জন্যে মজুর নিযুক্ত করা হয়, যা সে করতে পারে না, তবে এই ইজারা জায়েয হবে না। শরীয়ত অনুযায়ী যেসব কর্ম হারাম সেগুলোও মজুর দিতে পারে না। যেমন– ঋতুবতী মহিলাকে মসজিদে ঝাড়ু দেয়ার জন্যে নিযুক্ত করা অথবা স্বর্ণকারকে সোনারূপার পাত্র তৈরী করার জন্যে মজুরি দেয়া। এসবই বাতিল। চতুর্থ, সে কর্মটি যেন এমন না হয়, যা করা মজুরের উপর ওয়াজিব এবং এমনও না হয়, যা মালিকের পক্ষ থেকে অন্য কেউ করে দিলে চলে না। সুতরাং জেহাদ করার জন্যে মজুরি নেয়া জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে যে এবাদত একজনের পক্ষ থেকে অন্যজন আদায় করতে পারে না, তার জন্যেও মজুরি নেয়া বৈধ নয়। কেননা, এই এবাদত মালিকের পক্ষ থেকে হবে না; বরং মজুরের পক্ষ থেকে হবে। হাঁ, অপরের পক্ষ থেকে হজ্জ করা,

মৃতকে গোসল দেয়া, কবর খনন করা, মৃতকে দাফন করা এবং জানাযা বহন করার জন্যে মজুরি নেয়া জায়েয। পঞ্চম, সে কর্ম ও মুনাফা জ্ঞাত হওয়া দরকার। উদাহরণতঃ কাপড়ের ক্ষেত্রে দর্জির কাজ বলে দিতে হবে। শিক্ষককে সূরার শিক্ষা ও তার পরিমাণ জানিয়ে দিতে হবে। জন্তুর পিঠে বোঝা বহনের ক্ষেত্রে বোঝার পরিমাণ ও পথের দূরত্ব বলে দিতে হবে। মোট কথা, যেসব বিষয় স্বভাবতঃ বিরোধের কারণ হতে পারে, সেগুলো অস্পষ্ট না রেখে প্রথমেই পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে।

ইজারা সম্পর্কে এতটুকু বর্ণনাই আমরা যথেষ্ট মনে করছি। এতে প্রয়োজনীয় বিধানাবলী জানা হয়ে যাবে এবং কঠিন স্থান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া যাবে, যাতে বিজ্ঞজনের কাছে জিজ্ঞেস করে নেয়া যায়। এছাড়া যাবতীয় মাসআলা যথার্থ বিস্তারিতরূপে জানা মুফতীর কাজ– জনাসাধারণের নয়।

মুযারাবা বা স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তার মাধ্যমে ব্যবসা ঃ এই লেনদেনের রোকন তিনটি। প্রথম, পুঁজি। এতে শর্ত হল, তা নগদ ও নির্দিষ্ট হবে এবং উদ্যোক্তাকে সমর্পণ করে দিতে হবে। নগদ অর্থ, পুঁজি আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম হলে মুযারাবা জায়েয হবে না। কারণ, এগুলো দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য চলে না। নির্দিষ্ট হওয়া অর্থ, এক থলে ভর্তি টাকা দিলে মুযারাবা বৈধ হবে না। কারণ, এতে মুনাফার পরিমাণ অজ্ঞাত থাকবে। উদ্যোক্তাকে সমর্পণ করার ফায়দা হল, মালিক পুঁজি নিজের হাতে রাখার শর্ত করলে মুযারাবা শুদ্ধ হবে না। এ অবস্থায়ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় রোকন মুনাফা। এর জন্যে শর্ত হচ্ছে, অংশ হিসাবে নির্ধারিত হওয়া, অর্থাৎ, এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ, অর্ধেক অথবা অন্য কোন অংশ নির্ধারণ করতে হবে। এরূপ বলা যাবে না যে, একশ' টাকা দেব এবং অবশিষ্ট যা থাকবে তা আমার। কেননা, মুনাফা একশ' টাকার বেশী না-ও হতে পারে। তখন উদ্যোক্তার শ্রম পণ্ড হয়ে যাবে। তৃতীয় রোকন হচ্ছে, উদ্যোক্তার কর্ম। এতে কোন নির্দিষ্ট কর্মের শর্ত আরোপ করা যাবে না। উদাহরণতঃ যদি এই শর্ত আরোপ করা হয় যে, পুঁজি দিয়ে গৃহপালিত জন্তু ক্রয় করবে এবং তা দ্বারা বাচ্চা প্রজননের উদ্যোগ নেবে। বাচ্চাগুলো পরস্পরে ভাগ করে নেবে। অথবা গম ক্রয় করে রুটি তৈরী করবে। এতে যা মুনাফা হবে, তা

ভাগাভাগি করে নেবে। এরূপ করলে তা জায়েয হবে না। কেননা, রুটি তৈরী ও গৃহপালিত জন্তুর রাখালী করা ব্যবসা বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এগুলো শিল্পকর্ম। যদি উদ্যোক্তার সাথে শর্ত করা হয় যে, অমুক ব্যক্তি ছাড়া অন্যের কাছ থেকে ক্রয় করা যাবে না, অথবা এ বিশেষ ব্যবসা করা যাবে না, তবে মুযারাবা বাতিল হয়ে যাবে।

দুব্যক্তির মধ্যে মুযারাবার চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেলে উদ্যোক্তা পুঁজির মধ্যে উকিলের ন্যায় ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। পুঁজির মালিক যখন ইচ্ছা চুক্তি বাতিল করে দিতে পারে, কিন্তু বাতিল করার সময় যদি মুযারাবার মাল আসবাবপত্রের আকারে থাকে এবং তাতে কোন লাভ না হয়, তবে তা মালিককে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আসবাবপত্রকে নগদে পরিণত করে দেয়ার কথা বলার এক্তিয়ার মালিকের হবে না। যদি উদ্যোক্তা বলে, আমি আসবাবপত্র বিক্রি করে দেই এবং মালিক অস্বীকার করে, তবে মালিকের কথাই ধর্তব্য হবে। তবে যদি উদ্যোক্তা এমন গ্রাহক পায়, যার কাছে বিক্রয় করলে লাভ হবে, তবে উদ্যোক্তার কথা ধর্তব্য হবে। আর যদি পুঁজির উপর লাভও হয় এবং লাভ ও পুঁজি আসবাবপত্র আকারে থাকে, তবে উদ্যোক্তা পুঁজি পরিমাণ আসবাব বিক্রয় করে নগদ করে নেবে এবং অবশিষ্ট আসবাব লাভের মধ্যে থেকে যাবে। তাতে উভয়েই অংশীদার হবে। বছরের শুরুতে মালিক ও উদ্যোক্তা যাকাতের জন্যে মালের মূল্য অনুমান করবে। কিছু লাভ হলে উদ্যোক্তাই তার মালিক হয়ে যাবে।

মালিকের অনুমতি ছাড়া উদ্যোক্তা মুযারাবার পণ্য সফরে নিয়ে যেতে পারে না। নিয়ে গেলে এবং বিনষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ উদ্যোক্তা দেবে। কেননা, সফরে নিয়ে গেলে তার সীমালঙ্ঘন প্রমাণিত হবে। পক্ষান্তরে যদি মালিকের অনুমতিক্রমে উদ্যোক্তা পণ্য সফরে নিয়ে যায়, তবে পরিবহন ও পাহারার ব্যয় উদ্যোক্তার মাল থেকে দেয়া হবে, কিন্তু থান খোলা, ভাঁজ করা এবং অল্প কাজ, যা ব্যবসায়ীরা নিজেরা করে, তার জন্যে মজুরি দেয়ার এখতিয়ার উদ্যোক্তার নেই। যে শহরে মুযারাবার চুক্তি হয়, উদ্যোক্তা যতদিন সেই শহরে থাকে, ততদিন তার খাওয়া পরা ও বাসস্থানের ব্যয় বহন করবে; কিন্তু দোকানের ভাড়া তার যিম্মায় থাকবে না, কিন্তু উদ্যোক্তা যখন বিশেভভাবে মুযারাবার জন্যে সফর করবে, তখন তার ভরণপোষণ পুঁজি থেকে নির্বাহ করা হবে।